ইসলামের মর্মবাণী
জিহাদ ও জান্নাত

কাফেরদের উদ্দেশে
নিবেদিত

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

ইস্‌লামকে জানতে হলে

সর্বাগ্রে জানতে হবে তার

'জিহাদ ও জান্নাত'-কে

আল্লাহতা'আলা প্রতিটি মুসলমানের জাগতিক জীবনের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে (মৃত্যুর পর) খরিদ করে নিয়েছেন। জাগতিক জীবনে তারা যা পান বা পাবেন তার তুলনায় তাদেরকে জান্নাত-জীবনে যা দান করা হবে তা সাধারণ মানুষ কল্পনায়ও আনতে পারে না। সেখানে তারা অনন্ত জীবন-যৌবনের অধিকারী হয়ে অনন্তকাল ধরে বাদসাহী জীবনযাপন করবেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের তরফ থেকে এই ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করেন। তাই তারা কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে 'জিহাদে' (যার বিস্তারিত বিবরণ 'কলেমা ও জিহাদ' অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে) সামিল হতে এতটুকু দ্বিধা করেন না এবং অকাতরে প্রাণ দেন।

অদ্যাবধি পৃথিবীর বুকে ইসলাম বা মুহাম্মদ-পন্থীদের শুধু টিকে থাকা নয়, ক্রমবিস্তারের মূল চাবিকাঠি হলো, ভোগবাদী জীবন-দর্শনের হাতছানি—'ইহকাল এবং পরকালে'। ইহকালের প্রাপ্তি জিহাদ-লব্ধ 'মালে গণীমত' এবং পরকালের প্রাপ্তি আল্লাহ্-প্রদত্ত 'জান্নাত'। মোট কথা, তাদের হারাবার কিছু নেই।

এই ভোগবাদ বা Consumerism মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং উপজীব্য কিনা তার পর্যালোচনা করা এই পুস্তকের বিষয়বস্তু নয়। তবে আজ হোক, কাল হোক, তার বিচারের ভার বিরাট মানব-সমাজকেই নিতে হবে।

গ্রন্থকার

ইসলামের মর্মবাণী

জিহাদ ও জান্নাত

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

P. R. KUNDU
P-47, L.I.C. TOWNSHIP
KOLKATA-700 129

Islameyr Marmabani-Jihad O Jannat
by Priyaranjan Kundu

প্রকাশক

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
পি-৪৭, এল. আই. সি. টাউনশিপ
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০ ১২৯

প্রকাশ

প্রথম ঃ ১লা অক্টোবর, ২০০১ খৃষ্টাব্দ
দ্বিতীয় ঃ ১লা মে, ২০০৩ খৃষ্টাব্দ

পরিবেশক

মেসার্স দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রাকর

ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
গঙ্গানগর, কলকাতা-১৩২
ফোন ঃ ২৫৩৮ ৮৮৮০/৭০০৯

মূল্য

৩৫.০০

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মৎ-প্রণীত "ইসলামের মর্মবাণী-জিহাদ ও জান্নাত" এই শিরোনামে পুস্তকটির প্রথম প্রকাশের ভার যে সংস্থার উপর দিয়েছিলাম তারা তাদের সে-দায়িত্ব পালনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই পুস্তকটির দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন যখন অনুভূত হলো, তখন নিজেই সে-ভার গ্রহণ করলাম। এই সুযোগে পুস্তকটির কোথাও কোথাও কিছু রদবদল এবং সংযোজন করে দিলাম। সুতরাং একে দ্বিতীয় মুদ্রণ না বলে দ্বিতীয় সংস্করণ বলাই যুক্তিযুক্ত।

পাঠকের অবগতির জন্যে, এই পুস্তকের শেষে পরিশিষ্ট অংশে, একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা 'মুসলীম ইন্ডিয়া' (Muslim India)-র সম্পাদক শ্রী সৈয়দ সাহাবুদ্দীনের একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (যা বিগত ২০০২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল) আমাদের মতামত সহ, হুবহু সংযোজিত হলো।

প্রথম মুদ্রণে নানাপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও পাঠকসমাজ যেভাবে পুস্তকটিকে গ্রহণ করেছেন, আশা রাখি, বর্তমান সংস্করণটিও তাদের নিকট সমভাবে সমাদৃত হবে। অলমিতিবিস্তরেন।

১লা মে, ২০০৩ খৃষ্টাব্দ
কলকাতা-৭০০১২৯

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
গ্রন্থকার-প্রকাশক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. Bengali translation of
TARJAMA-E-QURAN MAJID
by Syed Abul A'la Maududi
Published by
BANGLA ISLAMI PRAKASHANI TRUST
27/B, LENIN SARANI, KOLKATA-700 013

২. সীরাতুন নবী
মূল ঃ আল্লামা শিবলী নো'মানী
আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভী
অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা
প্রকাশক ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
(প্রথম ভারতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ১৯৯৬)

৩. ISLAM, THE ARAB IMPERIALISM
by ANWAR SHAIKH
Reprint by A. GHOSH (Publisher)

৪. ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা
ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত

৫. Sarva Dharma Samabhava–A Fraud, A Hgpocrisy.
by Sarbasree P. N. Joshi & Chandra Kishore Chadha

৬. PAN ISLAMISM ROLLING BACK By P. N. JOSHI

সূচীপত্র

পুস্তকে যে-সব আরবী শব্দ পাওয়া যাবে

আরশ = খোদার সিংহাসনের নাম
ফেরেস্তা = আল্লাহ্‌র দূত
মালে গণীমত = জিহাদ-লব্ধ দ্রব্য
হালাল = অনুমোদিত
হারাম = নিষিদ্ধ
জান্নাত = বেহেস্ত
জাহান্নাম = জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড
জিহাদ = যুদ্ধ
কাফের = অমুসলমান
কলেমা = ইসলামের অঙ্গীকারপত্র
মু'মিন = মুসলমান
মোহাজীর = উদ্বাস্তু
মুজাহিদ = জিহাদে সামিল যোদ্ধা
নবুয়াত = পয়গম্বরী
রসুল = আল্লাহর প্রতিনিধি
রোজ কেয়ামত = শেষ বিচারের দিন
সীজদা করা = নতজানু হওয়া
দ্বীন = বিশ্বাস
অহী = আকার-ইঙ্গীত, পরোক্ষনির্দেশ
ঈমানদার = ইসলামে বিশ্বাসী
আহ্‌লি-কীতাব = ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাইবেল
জুম্মার নামাজ = শুক্রবারের নামাজ
নাযিল = অবতীর্ণ
পাক = পবিত্র
এতিম = নিরাশ্রয়
আযাব = শাস্তি

১। প্রাথমিক কিছু কথা

বেশ কিছুদিন পূর্বে সর্বশ্রী পি. এন. যোশী ও চন্দ্রকিশোর চাঁধা প্রণীত "Sarbadharma Samabhava— A Fraud, A Hypocrisy" শীর্ষক একখানি পুস্তিকা আমার হাতে আসে। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে, কুরআনের কিছু আয়াত উদ্ধৃত করে, বলছেন ঃ "Islam does not believe in the concept of equality i.e., Sarva Dharma Samabhava. It discriminates between the Muslims and non-Muslims. In Islam,all rights and privileges are reserved solely for the Muslims. Non-Muslims, according to Islam, are a condemned lot." তাঁরা মনে করেন, ইসলামের 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাহানায়' বা ধোঁকাবাজীতে কোন অ-মুসলমান যেন বিভ্রান্ত না হন। বিশেষ করে হিন্দুদের সম্বোধন করে তাঁরা বলেছেন ঃ "The Hindus should understand the character of Islam. The life of every Muslim is inextricably tied down to the tenets of Koran Shariff. There is no escape. If a million saints of all religions of the world, may go on preaching the concept of 'Sarva Dharma Samabhava' i.e., amity, harmony, goodwill and tolerance for a millennium, even then such a message shall have no effect on the Muslims." এই কথা ক'টি দিয়ে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে ইতি টেনেছেন। কিন্তু আমার মনে তখন ঝড় বইছে ঃ ইসলামে এমন কী আছে যার জন্যে এরূপ মনোভাব পোষণ করছেন, সৃষ্টির এমন কোন্ গূঢ় রহস্য ইসলামে লুক্কায়িত আছে যেখান থেকে কোন মুসলমানের পক্ষে এতোটুকু-ও সড়ে আসা সম্ভব নয়?

তাই আমি মনস্থ করলাম, এ-রহস্য জানতে হলে সর্ব প্রথম যথাসম্ভব ইসলামকে আমার জানতে হবে এবং তা জানতে হলে একখানা কুরআন ও হজরত মুহাম্মদের একখানা জীবনী, এই দু'খানা প্রামাণ্য গ্রন্থের সাথে পরিচিত হতে হবে। হাদীস শরীফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআনের ন্যায় হাদীস একখানা নয়—অসংখ্য, যেমন সাহী মুসলিম, জেম তিরমিজী, সাহী আল বুখারী, মিস্কট সরীফ, সুনুন ইবন-এ-মাজা প্রভৃতি। এতদ্‌ভিন্ন অনেক ভাষ্যকারও আছেন। সে এক বিরাট সমুদ্র বলা যায়। তদুপরি, হাদীসকে সম্বল করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পথে অন্তরায়-ও আছে। কারণ, একই ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা হজরত মুহাম্মদের বাণী বা কার্যকলাপ বিভিন্ন হাদীস বা ভাষ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবৃত করা আছে। উদাহরণস্বরূপ হজরত মুহাম্মদের নিজের জীবনের দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হলো, হজরত মুহাম্মদের পালিতপুত্র হজরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হজরত যয়নবের সাথে নিজের বিবাহ। এ ঘটনার দু'রকম বিবরণ আছে। 'সীরাতুন নবী'র গ্রন্থকার দু'টি বিবরণই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। যেহেতু দু'টি বিবরণই ভিন্ন এবং কিঞ্চিদধিক বিতর্কিত, তাই এর কোনটিই আমাদের উদ্ধৃতির অন্তর্ভুক্ত করলাম না। অনুসন্ধিৎসু

পাঠক উল্লিখিত কীতাবের ২৬৩ থেকে ২৬৬ পৃষ্ঠা ক'টি পড়ে দেখতে পারেন। অপরটি হলো, হজরত মুহাম্মদ দিনান্তে তাঁর বিবিদের সাথে কীভাবে অবসর বিনোদন করতেন তা নিয়ে। এঘটনার-ও দু'রকম বিবরণ পাই, 'সীরাতুন নবী'-শীর্ষক গ্রন্থে ঃ "হুযুর (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, প্রতিদিনই একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিবিগনের ঘরে যেতেন এবং কিছু সময় তাঁদের মাঝে অবস্থান করতেন। যাঁর ঘরে যেদিন রাত্রিযাপন করার পালা হত, শেষ পর্যন্ত সে ঘরেই থেকে যেতেন। এটি আবু দাউদের বর্ণনা। যারকানীতে হযরত উম্মে সালমার বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে যে প্রথম হযরত উম্মে সালমার ঘরে যেতেন। তারপর একে একে প্রত্যেক বিবির ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতেন। কোন কোন বর্ণনায় এমনও দেখা যায় যে, যেদিন যেঘরে অবস্থানের পালা আসত, সেঘরেই চলে যেতেন এবং অন্যান্য বিবিগণ সে ঘরে এসেই সমবেত হতেন এবং নানা আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। রাত্রি গভীর হলে সবাই যার যার ঘরে চলে যেতেন।" (সীরাতুন নবী-পৃষ্ঠা ৭৩১)।

সুতরাং পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারছেন, হাদীস থেকে উদ্ধৃত করতে হলে সব মত, বিবরণ বা ভাষ্যই উদ্ধৃত করতে হবে, নতুবা শুধু পাঠকই নয় সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে কান্ডে পরিণত হবে এবং নানাপ্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। তাই আমি যথাসম্ভব হাদীস শরীফকে কম টেনে মূল কুরআন শরীফ এবং হজরত মুহাম্মদের জীবনী অবলম্বন করে ইসলামকে জানা বা বুঝার চেষ্টা করেছি। তবে এর পাশাপাশি একজন বিশিষ্ট ইসলামবিদ জনাব আনোয়ার শেখের কিছু পুস্তক আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থসমূহ পাঠ করে যা সংগ্রহ করতে পেরেছি বা বুঝেছি তাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি। এতদ্সত্ত্বেও বলবো ঃ কোথাও যদি ভুল বুঝে থাকি এবং তা যদি কোনও সহৃদয় পাঠক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন তবে তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো।

যে প্রশ্ন তুলে আমরা আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম আবার আমাদের সে-প্রশ্নেই ফিরে যেতে হচ্ছে অর্থাৎ ইসলামে এমন কি সম্পদ আছে যা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রতিটি মুসলমান নিজ নিজ ধনসম্পদ তো বটেই এমন কি অমূল্য জীবন পর্যন্ত কবুল করতে রাজি আছেন? কুরআন শরীফ ও হজরত মুহাম্মদের জীবনী পাঠের পর এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি ঃ 'কোন সম্পদ রক্ষা করা কিংবা কোন ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তারা নিজেদের জানমাল কবুল করেন না, কবুল করেন ইহলোকে জিহাদ-লব্ধ 'মালে গণীমতের' অংশ লাভের আশায় এবং মৃত্যুর পর জান্নাতে অনন্ত জীবন ও অফুরন্ত ভোগ্যপণ্যের অধিকারী হওয়ার আকাংখায়। পুস্তকের যথাস্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দর্শনের ভাষায় এই চিন্তা বা মানসিকতাকে বলে বস্তুবাদ বা ভোগবাদ। ইংরেজিতে এর বর্তমান পরিভাষা Consumerism। আবার এই ভোগবাদের মানসিকতা থেকেই জন্ম নেয় সীমাহীন ভোগাকাংখা। এই ভোগাকাংখার কোন শেষ নেই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ

এবং সর্বশক্তিমান। এই সত্যটি আল্লাহ্‌র চেয়ে আর বেশি কে জানতেন? তাই কি তিনি, তাঁর অনুগামীদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে 'মালে গণীমত' সংগ্রহ ও ভোগের অনুমতি দিলেন? শুধু অনুমতি নয়, একাজ অর্থাৎ জিহাদকে ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তিনি মু'মিনদের সামনে যে আদর্শ তুলে ধরলেন তাতে সর্বশক্তিমান, মহান ও মেহেরবান খোদার মানমর্যাদা কতখানি রক্ষিত হয়েছে? তদুপরি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল পৃথিবীকে দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ যেসব দেশকে ইতিমধ্যেই ইসলামে রূপান্তরিত করা হয়েছে, আর দার-উল-হারাব অর্থাৎ যে-সব দেশে আধিপত্য কায়েম করার জন্যে মু'মিন ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলছে— এই দুই ভাগে ভাগ করলেন। আল্লাহতা'আলা ও তাঁর রসুল তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পৃথিবীটাকে দু'ভাগে ভাগ করে গোটা মানব-জাতির সামনে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। মনুষ্য সমাজ কি সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে, না কি কল্‌মা পড়ে খোদার বান্দাহ্ বনে যাবে?

২। ইসলামের জীবন-দর্শন ভোগবাদ, ত্যাগবাদ গুণাহ্

পৃথিবীতে প্রধানতঃ দু'প্রকারের জীবন-দর্শন বিদ্যমান— একটির নাম অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism), অপরটির নাম বস্তুবাদ (Materialism)। আমাদের বক্তব্য বুঝবার এবং বুঝাবার জন্যে আমরা-এই দু'প্রকার জীবন-দর্শনের নামের একটু হেরফের করবো অর্থাৎ প্রথমটির নাম ত্যাগবাদ এবং দ্বিতীয়টির নাম ভোগবাদ বলে এগিয়ে যাবো। এতে গুণগত কোন পার্থক্য হবে না, অথচ সাধারণ পাঠকের বিষয়বস্তু বুঝবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে।

যারা ভোগবাদে বিশ্বাসী সাধারণতঃ তারা ইহকালকেই চূড়ান্ত বলে মনে করেন, পরকালে তাদের বিশ্বাস নেই। কারণ মৃত্যুর পর তাদের কী পরিণতি হবে, যেহেতু তা তাদের জানা নেই তাই তারা পৃথিবীতে যতপ্রকারের ভোগ্যবস্তু আছে, তার সবটুকু পেতে চান। তাদের জীবন-দর্শন সংক্ষেপে এই ঃ "Eat, drink and be merry, tomorrow you may die" অথবা "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মিভূতস্য দেহস্য কুতো পরিবেদনা?" ইত্যাদি। কিন্তু ইসলাম বা মুহাম্মদ-পন্থীরা এর ব্যতীক্রম। তারা বস্তুবাদী অর্থাৎ ভোগবাদী হয়েও পরকালে বিশ্বাস করেন। তার অর্থ এই নয় যে, তারা অধ্যাত্মবাদ এবং ত্যাগবাদেও বিশ্বাসী। তাদের নিকট পরকালের চিত্র এবং সংগা একেবারে আলাদা এবং ভিন্ন। তাদের মতে, রোজ কেয়ামতে অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত বান্দাহ্‌দের করব থেকে তুলে নিয়ে জান্নাতে (Paradise) প্রবেশের ছাত্রপত্র বা আমলনামা দেবেন। সেখানে তারা চিরস্থায়ী জীবন-যৌবনের অধিকারী হয়ে অনন্তকাল ধরে অফুরন্ত ভোগ্যপণ্যের আস্বাদন করতে থাকবেন। এক কথায়, সেখানে তারা বাদশাহী জীবন-যাপন করবেন, চাওয়ার আগেই সব কিছু পেয়ে যাবেন। জান্নাতের জীবন-যাত্রা কীরূপ হবে তার বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকের অন্যত্র দেয়া আছে। ইতিমধ্যে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের

সমর্থনে কুরআন ও 'সীরাতুন নবী'-র কিছু কথা উদ্ধৃত করবো।

কুরআন শরীফ বলছেন, "হে ঈমানদারগণ, যে পাক জিনিষগুলি আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন তোমরা সেগুলিকে হারাম করিয়া লইও না এবং সীমালঙ্ঘন করিয়া যাইও না।......" (৫/৮৭)

অনুবাদকের টীকা ঃ এই আয়াতে দু'টি কথার আদেশ করা হয়েছে। প্রথম এই যে, নিজেরা হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী ব'নে ব'সো না। হালাল তা-ই যা' আল্লাহ হালাল করেছেন, ও হারাম তা-ই যা' আল্লাহ্ হারাম করেছেন। নিজেদের স্বেচ্ছাধীনে যদি কোন হালালকে হারাম কর তবে আল্লাহ্র কানুনের পরিবর্তে প্রবৃত্তির কানুনের অনুসারী হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আদেশ হচ্ছে—খৃষ্টান সন্ন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রাচ্য মরমিয়াবাদীদের মত বৈরাগ্য এবং দুনিয়ার বৈধ স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করার পন্থা অবলম্বন ক'রো না।

আমাদের সংযোজন ঃ আশা করা যায়, 'হালাল এবং হারামের' আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। হালাল ও হারামের বিস্তারিত বিবরণ পরের অধ্যায়ে দেয়া আছে।

'সীরাতুন নবীর' রচয়িতা আবু দাউদকে উদ্ধৃত করে বলছেন, 'ইসলামে সন্ন্যাস নেই'। (সীরাতুন নবী-পৃষ্ঠা ৪৬৮)। রচয়িতা উক্ত গ্রন্থের ৬৪৫ পৃষ্ঠায় বলছেন, "ইসলাম সন্ন্যাসের ধর্ম নয়। বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন যাপন ইসলাম অনুমোদন করেনি। বলা হয়েছে 'ইসলামে বৈরাগ্য নেই'।" একই পুস্তকের অন্যত্র উল্লেখ আছে, "মহানবী (সাঃ) সন্ন্যাসজীবন বা বৈরাগ্য পছন্দ করতেন না। ..... কুদামা ইবনে মাযাউন নামক জনৈক সাহাবী একজন সংগীসহ এসে আরয করলেন, আমাদের একজন বিবাহ না করার এবং অন্যজন পশুর বাহন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। জবাবে হুযুর (সাঃ) এরশাদ করলেন, 'আমি তো উভয়টিরই স্বাদ গ্রহণ করেছি।' হুযুরের (সাঃ) সম্মতি না পেয়ে দুজনেই স্ব স্ব ইচ্ছা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন।" (সীরাতুন নবী—পৃষ্ঠা ৬৪১)।

আমাদের সংযোজন ঃ আশা করা যায়, ইসলামের ভোগবাদের ব্যাপারে নতুন করে আর কোন সংযোজনের প্রয়োজন নেই। কুরআন স্বয়ং-ই বলেছেন, 'রসুলের জীবন মু'মিনদের নিকট আদর্শ'।

৩। ইসলামে যে-সব কাজ হালাল ও হারাম করেছে

হালাল কাজ

ক) "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্রের মত, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—যে-ভাবে ইচ্ছা কর—নিজেদের ক্ষেত্রে গমন কর......।" (২/২২৩)

আমাদের সংযোজন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসুল, ইচ্ছে করলে তাঁদের বান্দাহ্দের গুণাহ্ মাফ করে দিতে পারেন; আবার ভাল কাজ করলে তাদেরকে পুরস্কৃত-ও করতে পারেন।

এর ভেতর কোন বৈপরীত্য কিংবা অসংগতি নেই। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ব্যাপারে একবার বলছেন, 'এরা একে অন্যের পরিচ্ছদ স্বরূপ' (২/১৮৭), আবার অন্যত্র বলছেন, 'স্ত্রীগণ স্বামীদের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ—যে-ভাবে খুশী তারা তাদের ক্ষেতে যেতে পারেন' অর্থাৎ তাদের স্বামীরা যে-ভাবে খুশী তাদেরকে ব্যবহার করতে পারেন (২/২২৩)। বিপরীতমুখী এই দু'টি আয়াত কীভাবে কুরআনে স্থান পেলো, বুঝা মুস্কিল।

(খ) "তোমরা যদি ইয়াতিমদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তন্মধ্য হইতে দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিবাহ করিয়া লও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাহাদের সহিত 'ইনসাফ' করিতে পারিবে না তাহা হইলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ কর; কিংবা সেইসব মেয়েলোকদেরকে স্ত্রীত্বে বরণ করিয়া লও যাহারা তোমাদের মালিকানাভুক্ত হইয়াছে....." (৪/৩)

অনুবাদকের টীকা ঃ একথা লক্ষ্য করার বিষয় যে, একধিক স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দেওয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়নি। কারণ এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব থেকেই তা বৈধ ছিল এবং রসুলে করীমের (সঃ)-ও সে-সময়ে একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। আসলে যুদ্ধে শহীদদের এতিম সন্তান-সন্ততির সমস্যা সমাধানের জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি তোমরা এমনিতইে এতিমদের হ'ক আদায় করতে না পারো তবে তোমরা সেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর যাদের কাছে এতিম সন্তান-সন্ততি রয়েছে।

আমাদের সংযোজন ঃ খুব ভাল কথা। কিন্তু 'যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়' এই অংশটি যুক্ত হলো কেন? এতিম সন্তান-সন্ততি কি পছন্দসই মেয়েমানুষদেরই থাকে? যাদের দেখতে সুন্দর নয় অথবা বিগত-যৌবনা তাদের কি এতিম সন্তান-সন্ততি থাকে না বা থাকতে নেই? তাদের এতিম সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে সে ব্যাপারে এ আয়াতের কোথাও কোন উল্লেখ নেই। আবার অনুবাদকের টীকায় দেখতে পাই 'তোমরা সেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর যাদের কাছে এতিম সন্তান-সন্ততি রয়েছে'। ইসলাম বা মুহাম্মদপন্থীরা কোন নির্দেশটি অনুসরণ করবেন?

(গ) ".... কিন্তু যদি (কেবল বিবাহ হইয়া থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাগিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে (তাহাদের পরিবর্তে তাহাদের মেয়েদের সহিত বিবাহ করায়) তোমাদের কোন দোষ হইবে না।......" (৪/২৩)

(ঘ) "সেই-সব মেয়েলোকও তোমাদের প্রতি হারাম যাহারা অন্য কাহারো বিবাহাধীন রহিয়াছে; অবশ্য সেইসব স্ত্রীলোক ইহার বাহিরে যাহারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হইবে। ইহা আল্লাহতা'আলারই প্রদত্ত আইন, যাহা মানিয়া চলা তোমাদের পক্ষে একান্তই কর্তব্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।...." (৪/২৪)

অনুবাদকের টীকা ঃ অর্থাৎ যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসে, তাদের কাফের স্বামী 'দারুল হারাবে' অর্থাৎ কাফের শত্রুদের দেশে বর্তমান থাকলেও তাহা তোমাদের জন্য

হারাম নয়। কেননা, 'দারুল হারাব' থেকে 'দারুল ইসলামে' আসার পর তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

আমাদের সংযোজন ঃ এখানে উল্লেখিত 'দারুল হারাব' এবং 'দারুল ইসলাম' এই দুই জোড়া শব্দ ইসলামে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দারুল হারাবের অর্থ, এখন পর্যন্ত যে-সব দেশ ইসলামে রূপান্তরিত হয়নি; আর দারুল ইসলামের অর্থ হলো, যে-সব দেশ ইতিমধ্যেই ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথম শব্দজোড়ার অর্থ 'না-পাক' অর্থাৎ অপবিত্র এবং দ্বিতীয় শব্দ জোড়ার অর্থ 'পাক' অর্থাৎ পবিত্র। 'না-পাক' দেশ বা স্থান থেকে যে-সব বস্তু (স্ত্রীলোক সহ) 'পাক'-দেশ বা স্থানে আনা হয় (হোক না লুটের মাল) সে-সব বস্তু তৎক্ষণাৎ পাক-সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

(ঙ) ''আজ তোমাদের জন্য সকল পাক জিনিসই হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আহলি-কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খানা তাহাদের জন্য-ও হালাল। এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল—তাহারা ঈমানদার লোকদের মধ্য হইতে হউক কিংবা পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে হউক।....'' (৫/৫)

আমাদের সংযোজন ঃ আহলি-কিতাব অর্থে ইহুদি ও খৃষ্টানদের বুঝনো হচ্ছে এবং কিতাব অর্থে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন টেষ্টামেন্টকে বুঝান হচ্ছে। ঈমানদার অর্থে মুসলমানদের বুঝনো হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত জিহাদলব্ধ 'মালেগণীমত'-ও হালাল করা হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ 'জিহাদ ও মালে গণীমত' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

হারাম কাজ

(ক) বিবাহের ব্যাপারে নির্দেশ ঃ ''তোমাদের প্রতি হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী এবং তোমাদের সেইসব মা যাহারা দুধ খাওয়াইয়াছে। আর তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যাহারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিতা-পালিতা হইয়াছে—সেইসব স্ত্রীর মেয়েরা যাহাদের সহিত তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যদি (কেবল বিবাহ হইয়া থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে (তাহাদের পরিবর্তে তাহাদের মেয়েদের সহিত বিবাহ করায়) তোমাদের কোন দোষ হইবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের প্রতি হারাম হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে যাহা হইয়াছে, তাহাতো হইয়াই গিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।'' (৪/২৩)।

(খ) খাদ্যের ব্যাপারে নির্দেশ ঃ ''তোমাদের প্রতি হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সেইসব জন্তু যাহা খোদা ছাড়া অপর কাহারো নামে যবেহ্ করা হইয়াছে। যাহা গলায় ফাঁস পড়িয়া, আঘাত পাইয়া বা উপর হইতে পড়িয়া গিয়া অথবা

সংঘর্ষে পড়িয়া মরিয়াছে, বা যাহাকে কোন হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করিয়াছে—যাহা জীবিত পাইয়া যবেহ্ করিয়াছে তাহা ব্যতীত— এবং যাহা কোন 'আস্তানায়' যবেহ্ করা হইয়াছে। সেই সংগে পাশা খেলার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য জানিয়া লওয়াও তোমাদের জন্য জায়েয নহে। এই সব কাজ সম্পূর্ণ ফাসেকী। আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ নিরাশ হইয়াছে। কাজেই তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না; বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করিয়াছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে কবুল করিয়া লইয়াছি। অতএব হালাল ও হারামের যে সব বিধিনিষেধ তোমাদের প্রতি আরোপ করিয়াছি তাহা পূর্ণরূপে পালন কর। অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হইয়া উহার মধ্য হইতে কোন জিনিস খাইয়া ফেলে—গুণাহ্ করার কোন প্রবণতা ছাড়াই—তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ গুণাহ্ মাফকারী ও রহমত দান কারী।" (৫/৩)

৪। জান্নাতের প্রাপ্তির তুলনায় পৃথিবীর প্রাপ্তি কিছুই নয়

জাগতিক জীবনে একটি মানুষের [এখানে মানুষ বলতে পুরুষ মানুষ বুঝতে হবে; কারণ ইসলামে নারীকুল হলো পুরুষের একপ্রকার ভোগ্যপণ্য (২/২২৩)] পক্ষে যে-সব ভোগ্য পণ্যের প্রয়োজন হয় তা পর্যাপ্ত পরিমাণেই ইসলামে অনুমোদিত। কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মতে জান্নাতের প্রাপ্তির তুলনায় এ-সব কিছুই নয়। কুরআন বলছেন ঃ

(ক) "মানুষের জন্য তাহাদের মনঃপুত জিনিস, নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু, কৃষি-জমি বড়ই আনন্দ দায়ক ও লালসার বস্তু বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। মূলতঃ ভাল আশ্রয় তো খোদার নিকটই রহিয়াছে।" (৩/১৪)

আমাদের সংযোজন ঃ এই আয়াতে বর্ণিত 'ভাল আশ্রয়' বলতে জান্নাত-জীবন বুঝতে হবে—যেখানে ভোগ্যপণ্যের অঢেল ব্যবস্থা যা কোনদিন শেষ হবে না, ফুরিয়েও যাবে না।

(খ) "আর এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়, শুধু একটি খেলা ও মন ভুলানোর ব্যাপার মাত্র। আসলে জীবনের ঘর তো পরকাল। হায়, একথা যদি ইহারা জানিত!" (২৯/৬৪)

(গ) "ভালভাবে জানিয়া লও, এই দুনিয়ার জীবনটা শুধু ইহাই যে, ইহা একটা খেলা-মনভুলানোর ব্যাপার এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব অহংকার করা, আর ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়া একজনের অন্যজন হইতে অগ্রসর হইয়া যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। .... উহার বিপরীত হইতেছে পরকাল। উহা এমন স্থান যেখানে কঠিন আযাব রহিয়াছে; আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা-মার্জনা এবং তাঁহার সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।" (৫৭/২০)

আমাদের সংযোজন ঃ দুনিয়ার জীবন যদি এতোই ছেলেখেলার ব্যাপার তবে তা

নিয়ে এতো মারামারি কাটাকাটি কেন? কেনইবা জিহাদের আগুণ প্রজ্জ্বলিত করে দুনিয়ার বুকে লংকা-কান্ডের সৃষ্টি করা? উত্তর অত্যন্ত সহজ। এ-সব কিছুরই উদ্দেশ্য ঃ পৃথিবীতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার অর্থই হলো জিহাদ ঘোষণা করে কাফেরদের ছলে-বলে-কৌশলে মুসলমান করা। এ-কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারলেই না জান্নাতে প্রবেশের অধিকার মিলবে! সুস্থ-সবল দেহ নিয়ে জিহাদে সামিল না হলে আল্লাহ্-র আযাব (শাস্তি) তার উপর নেমে আসবেই।

৫। 'রোজ কেয়ামতে' প্রতিটি মুসলমানকে জান্নাতে পাঠিয়ে যে-ভাবে পুরস্কৃত করা হবে

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জান্নাত-দানের ওয়াদা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পাকা ওয়াদা। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতের বর্ণময় ও মনমুগ্ধকর বিবরণ দিয়ে অসংখ্য আয়াত আছে। আমরা তা থেকে মাত্র কয়েকটি আয়াত নিম্নে তুলে দিচ্ছি। তারও আগে একজন বিশিষ্ট ইসলামবিদ জনাব আনোয়ার শেখ জান্নাতের মূল্যায়ন কীভাবে করেছেন তার সাথে পাঠকের কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকার প্রয়োজন আছে। তিনি বলছেন ঃ "Paradise is the largest and the sweetest carrot that was ever dangled before the Arabs. Just compare the description of paradise with the burning sands of Arabia, without water, trees, pastures, rivers and gardens. Worse still, Arabia did not have plentiful women, and that is what made the Arabs hanker after the feminine gender. Look at the following verse from the Koran which point to the sexual appeal of Islam." (Courtesy : Islam, The Arab Imperialism by Anwar Shaikh. pp. 59-60).

(ক) "(তাহাদিগকে বলা হইবে) খাও ও পান কর স্বাদ ও মজা সহকারে, তোমাদের সেইসব কাজের প্রতিফলরূপে যাহা তোমরা করিতেছিলে। তাহারা সামনা-সামনি বসানো আসন সমুহে ঠেস লাগাইয়া বসিবে। আর আমরা সুলোচনা হুরদিগকে তাহাদের সহিত বিবাহ দিব।" (৫২/১৯-২০)। প্রসঙ্গতঃ শেখ সাহেব হাদিস তিরমিজী ভল্যুম দুই (পৃষ্ঠা ৩৫-৪০) থেকে হুরদের রূপ ও গুণের বর্ণনা তুলে ধরেছেন ঃ

i) 'A houri is a most beautiful young woman with a transparent body. The marrow of her bones is visible like the interior lines of pearls and rubies. She looks like red wine in a white glass.

ii) 'She is of white colour, and free from routine physical disabilities of an ordinary woman such as menstruation,

manopause, urinal and offal discharge, child-bearing, and related pollution.

iii) 'She is a woman characterised by modesty and flexing glances; she never looks at any man except her husband, and feels grateful for being his wife.

iv) 'A houri is a young woman, free from odium and animosity. Besides, she knows the meaning of love and has the ability to put it into practice.

v) 'A houri is an immortal woman, who does not age. She speaks softly and does not raise her voice at her man; she is always reconciled with him. Having been brought up in luxury, she is luxury herself.

vi) 'A houri is a girl of tender age, having large rising breasts which are round, and not inclined to dangle. Houris dwell in palaces of splendid surroundings.

'Now add to this description of houris, what Mishkat volume three says on pages 83-97.

vii) 'If a houri looks down from her abode in heaven onto the earth, the whole distance shall be filled with light and fragrance.

viii) 'A houri's face is more radiant than a mirror, and one can see one's image in her cheek. The marrow of her shins is visible to the eyes.

ix) 'Every man who enters paradise shall be given seventy-two houris; no matter at what age he had died, when he enters paradise, he will become a thirty year old and he will not age any further.

x) 'Tirmizi, vol. 2 states on page 138 : A man in paradise shall be given virility equal to that of one hundred men'. It should be noted that men who are so potent shall not be inclined to do anything except love-making. This is the reason, that according to Islam, sexual gratification is the ultimate goal of

life. This is the true Islamic idea of salvation'. (Courtesy : Islam, The Arab Imperialism by Anwar Shaikh. pp. 60-62).

আপাততঃ হুরদের বর্ণনা শেষ। এবার জান্নাতের বিবরণ ঃ

(খ) "এবং হে নবী, যাহারা এই কিতাবের (পড়ুন কুরআন) প্রতি ঈমান আনে এবং (উহার অনুসারে) নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করিয়া লয়, তাহাদের এই সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য এমন সব বাগীচা নির্দিষ্ট রহিয়াছে, যেগুলির নিম্নদেশ হইতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকিবে। এইসব বাগীচার ফল বাহ্যতঃ দেখিতে পৃথিবীর ফলসমূহের মতই হইবে। যখনই কোন ফল তাহাদের খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিয়া উঠিবে ঃ এই ধরণের ফলই ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমাদিগকে দেওয়া হইত। তাহাদের জন্য তথায় পবিত্রা স্ত্রী হইবে এবং তাহারা সেখানে চিরদিন থাকিবে।" (২/২৫)

(গ) ".... যাহারা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করিবে তাহাদের জন্য খোদার নিকট বাগীচা রহিয়াছে যাহার পাদদেশ হইতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। সেখানে তাহারা চিরন্তন জীবন লাভ করিবে, পবিত্রা স্ত্রীগণ তাহাদের সংগী হইবে এবং খোদার সন্তোষলাভ করিয়া তাহারা ধন্য হইবে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁহার বান্দাহ্দের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন।" (৩/১৫)

(ঘ) "... কাজেই যাহারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছে, আমারই পথে নিজেদের ঘরবাড়ী হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে ও নির্যাতিত হইয়াছে এবং আমারই জন্য লড়াই করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে তাহাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে আমি এমন বাগীচায় স্থান দিব যাহার নীচ হইতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইবে। ..." (৩/১৯৫)

(ঙ) "পক্ষান্তরে মুত্তাকী লোকেরা, বাগীচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে হইবে। এবং তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ইহাতে প্রবেশ কর পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে। তাহাদের দিলে যাহা কিছু সামান্য কপটতার ত্রুটি থাকিবে তাহা আমরা বাহির করিয়া দিব। তাহারা পরস্পরে ভাই ভাই হইয়া সামনা-সামনি আসনসমূহের উপর বসিবে। তাহারা সেখানে না কোন কষ্টের সম্মুখীন হইবে, না সেখান হইতে তাহারা কখনো বহিস্কৃত হইবে।" (১৫/৪৫-৪৮)

(চ) "তাহাদের জন্য চিরসবুজ চিরশ্যামল জান্নাত রহিয়াছে যাহার নিম্নদেশ হইতে ঝর্ণাধারা সদা প্রবহমান থাকিবে। সেখানে তাহাদিগকে স্বর্ণের কঙ্কন দ্বারা অলংকৃত করা হইবে। সূক্ষ্ম ও গাঢ় রেশমের সবুজ পোষাক তাহারা পরিধান করিবে এবং উচ্চ মসনদের উপর তাহারা ঠেস লাগাইয়া বসিবে। আর ইহা অতি উত্তম কর্মফল ও উঁচুদরের অবস্থিতির স্থান।" (১৮/৩১)

(ছ) "সর্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি নেয়ামতে ভরা জান্নাতও—যাহাতে তাহারা সম্মান সহকারে বসবাস করিবে। আসনে মুখা-মুখী আসীন হইবে। শরাবের ঝর্ণা-সমুহ হইতে পান-পাত্র

পূর্ণ করিয়া তাহাদের মধ্যে ঘুরানো হইবে। উহা উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয়-সুস্বাদু। না তাহাদের দেহে উহার দরুন কোন ক্ষতি হইবে, না তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারী, সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্টা নারীগণ হইবে। এমন স্বচ্ছ যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি।" (৩৭/৪২-৪৯)

(জ) 'ইহা ছিল একটি স্মরণ। (এখন শোন) মুত্তাকী লোকদের জন্য নিঃসন্দেহে অতি উত্তম পরিণাম রহিয়াছে,—চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাহার দুয়ারগুলি তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া থাকিবে। তাহাতে তাহারা হেলান দিয়া আসীন হইয়া থাকিবে। প্রচুর ফল ও পানীয় চাহিয়া পাঠাইবে। আর তাহাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকিবে।....এইসব জিনিস এমন যাহা হিসাবের দিন দান করার জন্য তোমাদের নিকট ওয়াদা করা যাইতেছে। ইহা আমাদের দেওয়া রেয্‌ক, ইহা কখনই ফুরাইয়া যাইবে না।" (৩৮/৪৯-৫৪)

(ঝ) "খোদাভীরু লোকেরা নিরাপদ স্থানে হইবে, বাগবাগীচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, পাতলা রেশমী ও মোটা রেশমী পোষাক পরিহিত, সামনা-সামনি আসীন। ইহাই হইবে জাঁক-জামক। আর আমরা সুন্দরী রূপসী ও হরিণ-নয়না নারীদিগকে তাহাদের স্ত্রী বানাইয়া দিব। সেখানে তাহারা পূর্ণ নিশ্চিন্ততায় সর্বপ্রকারের স্বাদপূর্ণ জিনিসসমূহ পাইতে চাহিবে। সেখানে মৃত্যুর স্বাদ তাহারা কখনই আস্বাদন করিবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাহাদের হইয়া গিয়াছে, তাহা হইয়া গিয়াছে। আর আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহে তাহাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন। বস্তুতঃ ইহাই বড় সাফল্য।" (৪৪/৫১-৫৭)

(ঞ) "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানরাও ঈমানের কোন এক মাত্রায় তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের সেই সন্তানদিগকেও আমরা (জান্নাতে) তাহাদের সহিত একত্রিত করিব, আর তাহাদের আমলে কোন হ্রাস করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে গচ্ছিত রাখা আছে। (৫২/২১)

"আমরা তাহাদিগকে সর্বপ্রকারের ফল ও গোশত—যে জিনিসই তাহাদের মন চাহিবে—খুব বেশী বেশী দিয়া যাইতে থাকিব।" (৫২/২২)

"তাহারা পানপাত্র পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আগাইয়া আগাইয়া গ্রহণ করিতে থাকিবে। সেখানে কোনরূপ হল্লা কোলাহল বা চরিত্রহীনতা হইতে পারিবে না," (৫২/২৩)

"আর তাহাদের সেবাযত্নে সেই সব বালক দৌড়াদৌড়ি করিতে নিযুক্ত থাকিবে যাহারা কেবলমাত্র তাহাদের জন্যই হইবে। ইহারা এমন সুন্দর সুশ্রী, যেমন লুকাইয়া রাখা মুক্তা।" (৫২/২৪)

(ট) "তাহারাই তো সান্নিধ্যশালী লোক; নেয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান ও বসবাস করিবে। আগেরকালের লোকেদের মধ্যে বেশী সংখ্যক হইবে, আর পিছনের লোকদের মধ্যে কমসংখ্যক। মণি-মুক্তাখচিত আসনসমূহের উপর হেলান দিয়া মুখো-মুখী হইয়া আসীন হইবে। তাহাদের মজলিশসমূহে চিরন্তন ছেলেরা প্রবহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পানপাত্র ও

হাতলধারী সুরাভান্ড ও আচখোরা লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে। উহা পান করায় তাহাদের মাথা মুরিবে না, তাহাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ পাইবে না। আর উহারা তাহাদের সম্মুখে রকম-বেরকমের সুস্বাদু ফল পেশ করিবে;—যেন যেটা পছন্দ সেটাই তুলিয়া লইতে পারে। ইহা ছাড়া পাখীর গোশ্‌তও সামনে রাখিবে, যেটির গোশ্‌ত ইচ্ছা হইবে লইতে পারিবে। আর তাহাদের জন্য সুন্দর চক্ষুধারী হুরগণও থাকিবে। উহারা সুশ্রী-সুন্দরী হইবে—লুকাইয়া রাখা মুক্তার মতো। এই সব কিছুই সেই সব আমলের শুভ প্রতিফল স্বরূপ তাহারা পাইবে, যাহা তাহাদের দুনিয়ার জীবনে করিতেছিল। সেখানে তাহারা কোন বাজে কথা ও পাপের বুলি শুনিতে পাইবে না। যে কথা-বার্তাই হইবে, তাহা ঠিকঠিক ও যথাযথ হইবে।" (৫৬/১১-২৬)

(ঠ) "আর ডান বাহুর লোকেরা; ডান বাহুর লোকেদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কি বলা যায়। তাহারা কাঁটাহীন কুলবৃক্ষসমূহ, থরে থরে সাজানো কলাসমূহ, বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবহমান পানি, শেষহীন অবারিত ও বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে এমন ফল, এবং উচ্চ আসন কেন্দ্রসমূহে অবস্থিত হইবে। তাহাদের স্ত্রীগণকে আমরা বিশেষভাবে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিব, এবং তাহাদেরকে কুমারী বানাইয়া দিব। নিজেদের স্বামীদের প্রতি আসক্ত এবং বয়সে সমকক্ষ, এইসব কিছুই ডানবাহুর লোকদের। তাহারা আগের কালের লোকদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক হইবে, আর পিছনের কালের লোকদের মধ্য হইতেও বহু।" (৫৬/২৭-৪০)

(ড) "নেক্‌কার লোকেরা (জান্নাতে) শরাবের এমন সব পাত্র পান করিবে যাহার সহিত কর্পূর সংমিশ্রণ হইবে। ইহা একটি প্রবহমান ঝর্ণা হইবে, যাহার পানির সঙ্গে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌রা শরাব পান করিবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই উহার শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া লইবে।" (৭৬/৫-৬)

(ঢ) "আর তাহাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাহাদিগকে জান্নাত ও রেশমী পোষাক দান করিবেন। তথায় তাহারা উচ্চ আসন-সমূহে ঠেস দিয়া বসিবে। তাহাদিগকে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করিবে, না শীতের প্রকোপ। জান্নাতের ছায়া তাহাদের উপর অবনত হইয়া থাকিবে এবং উহার ফলসমুহ সর্বদা তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকিবে। তাহারা ইচ্ছামত উহা পাড়িতে পারিবে। তাহাদের সম্মুখে রৌপ্য-নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হইবে। সেই কাঁচ যাহা রৌপ্য জাতীয় হইবে এবং সেগুলিকে (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমাণ মত ভর্তি করিয়া রাখিবে। তাহাদিগকে তথায় এমন সুরা-পাত্র পান করানো হইবে যাহাতে শুঁটের সংমিশ্রণ থাকিবে। ইহা হইবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, উহাকে 'সালসাবীল' বলা হয়। তাহাদের সেবাকার্যে এমন সব বালক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিতে থাকিবে যাহারা চিরকালই বালক থাকিবে। তোমরা তাহাদিগকে দেখিলে মনে করিবে, ইহারা যেন মুক্তা—ছড়াইয়া দেওয়া। তথায় যে-দিকেই তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, শুধু নি'আমত আর

নি'আমতই এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তুমি দেখিতে পাইবে। তাহাদের উপর সূক্ষ্ম রেশমের সবুজ পোষাক, কিংখাব ও মখমলের কাপড় থাকিবে। তাহাদিগকে রৌপ্যের কংকন পড়ানো হইবে এবং তাহাদের খোদা তাহাদিগকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাইবেন। ইহাই হইল তোমাদের শুভ প্রতিফল। আর তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবান রূপে গৃহীত হইয়াছে।" (৭৬/১২-২২)

অনুবাদকের টীকা ঃ সুরা হজ্জের ২৩ নম্বর আয়াত ও সুরা ফাতেরের ৩৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সেখানে তাদের সোনার কংকন পরানো হবে। এর থেকে জানা গেল তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী কখনও সোনার কংকন পরিধান করিবে, কখনও রূপার কংকন পরিধান করিবে এবং কখনও উভয়কে মিলিয়া পরিধান করিবে।

(ণ) "নিঃসন্দেহে মুত্তাকী লোকদের জন্য একটা সাফল্যের মর্যাদা রহিয়াছে। বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর ও নবোদ্ভিন্ন মেয়েরা এবং উচ্ছসিত পানপাত্র।" (৭৮/৩১-৩৪)

(ত) "নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা আফুরন্ত নি'আমতের মধ্যে হইবে, উচ্চ আসনের উপর আসীন হইয়া দৃশ্যাবলী দর্শন করিতে থাকিবে। তাহাদের মুখাবয়বে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের ঔজ্জ্বল্য অবলোকন করিবে। তাহাদিগকে উত্তম-উৎকৃষ্ট মুখবন্ধ শরাব পান করানো হইবে। উহার উপর মিশ্‌ক-এর সিল লাগানো থাকিবে। যে-সব লোক অন্যান্যদের উপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে চাহে তাহারা যেন এই জিনিস লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে চেষ্টা করে। সেই শরাবে তাসনীম মিশ্রিত হইবে। ইহা একটি ঝর্ণা, উহার পানির সাথে নিকটবর্তী লোকেরা শরাব পান করিবে।" (৮৩/২২-২৮)

(থ) "আর খোদার সম্মুখে পেশ হইবার ভয় পোষণ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই দুইখানি বাগান রহিয়াছে। (৫৫/৪৬)

"তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কার তোমরা অস্বীকার করিবে? (৫৫/৪৭)

"সবুজ সতেজ ডাল-পালায় ভরপুর। (৫৫/৪৮)

তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ পুরস্কারকে তোমরা মিথ্যা মনে করিবে? (৫৫/৪৯)

"দুইটি বাগানে দুই ধারা সদা প্রবহমান (৫৫/৫০)

তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নি'আমতকে তোমরা অসত্য-মনে করিবে? (৫৫/৫১)

"উভয় বাগানে প্রত্যেকটি ফলের দুইটি রকম হইবে। (৫৫/৫২)

তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নি'আমতকে তোমরা অসত্য মনে করিবে? (৫৫/৫৩)

"জান্নাতী লোকেরা এমন শয্যার উপর ঠেস লাগাইয়া বসিয়া থাকিবে যাহার আস্তরণ মোটা রেশমের তৈরী হইবে। আর বাগানের ডাল-পালা ফলের ভারে ঝুঁকিয়া পড়া থাকিবে। (৫৫/৫৪)

তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নি'আমত তোমরা অস্বীকার করিবে? (৫৫/৫৫)

"এই নিয়ামত সমুহের মধ্যে লজ্জাবনত-নয়না ললনারাও থাকিবে—তাহাদেরকে এই

জান্নাতী লোকদের পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শও করে নাই। (৫৫/৫৬)

তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে অসত্য মনে করিবে? (৫৫/৫৭)

"উহারা এমনই সুন্দরী রূপসী যেমন হীরা ও মুক্তা। (৫৫/৫৮)

তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অসত্য মনে করিবে? (৫৫/৫৯)

"শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হইতে পারে? (৫৫/৬০)

তাহা হইলে হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ উত্তম গুণাবলীকে অসত্য মনে করিবে?" (৫৫/৬১)

(দ) "আর সেই দুইটি বাগান ছাড়াও আরও দুইটি বাগান হইবে।

তোমাদের খোদার কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অসত্য মনে করিবে? (৫৫/৬২-৬৩)

অনুবাদকের টীকা ঃ সম্ভবতঃ প্রথম দুই উদ্যান বাসস্থান ও দ্বিতীয় দুই উদ্যান প্রমোদ-ক্ষেত্র হবে।

আমাদের সংযোজন ঃ 'আরও দুইটি বাগানের' বিবরণ প্রায় একই রকম। তাই সে-সবের আর উদ্ধৃতি দিলাম না। এবং একই সংগে জান্নাতে প্রাপ্তির তালিকাও আর দীর্ঘ করলাম না। কারণ, তা না করলে, পুরো কুরআন খানাকেই উদ্ধৃত করতে হয়।

এই অধ্যায়ে মুসলমানরা 'রোজ কেয়ামতে' জান্নাতে যেয়ে কী কী পুরস্কার পাবেন অথবা তাদেরকে কীভাবে পুরস্কৃত করা হবে তার কিছু বিবরণ দেয়া গেলো। পরবর্তী অধ্যায়ে অমুসলমানরা অর্থাৎ কাফেররা সেদিন যেভাবে জাহান্নামে যেয়ে শাস্তি পাবে তার কিছু নমুনা তুলে ধরবো।

৬। জাহান্নামে কাফেরদের যে-ভাবে শাস্তি দেয়া হবে

প্রথমে শেষ বিচারের দিনের চিত্রটি তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

(ক) "হে জ্বিন ও মানুষের দল! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সীমানা লঙ্ঘন করিয়া পালাইয়া যাইতে সক্ষম হও, তবে পালাইয়া দেখ না, পালাইয়া যাইতে পার না, সেজন্য তো খুব বেশী শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন।" (৫৫/৩৩)

(খ) "(পালাইয়া যাইতে চেষ্টা করিলে) তোমাদের উপর আগুনের শিখা ও ধুঁয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, তোমরা যাহার মুকাবিলা করিতে পারিবে না।" (৫৫/৩৫)

আমাদের সংযোজন ঃ আল্লাহ্ পূর্বোক্ত আয়াত দু'টিতে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে ক্ষমতার যুদ্ধে আহ্বান করছেন।

(গ) "(অতঃপর কি হইবে তখন) যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ও লাল চামড়ার মত রক্তবর্ণ ধারণ করিবে?" (৫৫/৩৭)

(ঘ) "সেদিন কোন মানুষ ও কোন জ্বিনকে তাহার গুনাহ্ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইবে না। (৫৫/৩৯)

"অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হইয়া যাইবে এবং তাহাদের কপালের চুল ও পা ধরিয়া হেচড়াইয়া টানিয়া নেওয়া হইবে। (৫৫/৪১)

"(তখন বলা হইবে) ইহা সেই জাহান্নাম, অপরাধী পাপীরা যাহাকে অসত্য মনে করিয়া লইয়াছিল। (৫৫/৪৩) "সেই জাহান্নাম ও টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটন্ত উত্তপ্ত পানির মধ্যে তাহারা আবর্তন করিতে থাকিবে। (৫৫/৪৪) "তাহা হইলে তোমরা তোমাদের খোদার কোন্‌ কোন্‌ শক্তি-পরাক্রমকে অবিশ্বাস করিবে? (৫৫/৪৫)

(ঙ) "যে সব লোক তাহাদের রব্বকে অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছে তাহাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রহিয়াছে। উহা মূলতঃই অত্যন্ত খারাব পরিণতির স্থান। (৬৭/৬)

"তাহারা যখন উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহার ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনিতে পাইবে। (৬৭/৭)

"উহা তখন উথাল-পাতাল করিতে থাকিবে, ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় উহা দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হইবে। প্রতিবারে যখনই উহাতে কোন জনসমষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবে, উহার কর্মচারীরা সেই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে ঃ কোন সাবধানকারী কি তোমাদের নিকট আসে নাই? (৬৭/৮)

"তাহারা জওয়াবে বলিবে ঃ 'হ্যাঁ, সাবধানকারী আমাদের নিকট আসিয়াছিল বটে; কিন্তু আমরা তাঁহাকে অমান্য ও অবিশ্বাস করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, আল্লাহ্‌ কিছুই নাযিল করেন নাই।' ..... (৬৭/৯) "আর তাহারা বলিবে ঃ 'হ্যা, আমরা যদি শুনিতাম ও অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা আজ এই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকা আগুনের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হইতাম না'।" (৬৭/১০) "এইভাবে তাহারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া লইবে। এই দোজখীদের উপর অভিশাপ।" (৬৭/১১)

(চ) "আর এই লোকেরা যখন একত্রিত হইয়া আল্লাহ্‌র সামনে উন্মোচিত হইবে, তখন ইহাদের মধ্যে যাহারা পৃথিবীতে দুর্বল ছিল তাহারা যাহারা বড়লোক বনিয়াছিল তাহাদিগকে বলিবে ঃ দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহর আযাব হইতে আমাদিগকে বাঁচাইবার জন্যও কিছু করিতে পার? তাহারা জওয়াব দিবে ঃ আল্লাহ্‌ যদি আমাদিগকেই মুক্তির কোন পথ দেখাইতেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকেও দেখাইতাম। এখন আহাজারী করি কি ধৈর্য্য অবলম্বন করি উভয়ই আমাদের জন্য সমান। আমাদের রক্ষা ও মুক্তিলাভের কোন উপায় নাই।" (১৪/২১)

(ছ) "আর যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইবে তখন শয়তান বলিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ যেসব ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা সবই সত্য ছিল। আর আমি যত ওয়াদাই করিয়াছিলাম তন্মধ্যে কোন একটিও পুরা করি নাই। তোমাদের উপর আমার তো কোন জোর ছিল না। আমি ইহা ছাড়া আর তো কিছু করি নাই—শুধু ইহাই করিয়াছি যে, তোমাদিগকে আমার পথে চলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি। আর তোমরা

আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছ। এখন আমাকে দোষ দিও না—তিরস্কার করিও না, নিজেকেই নিজে তিরস্কৃত কর। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনিতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনিতে পাও। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানাইয়া লইয়াছিলে, আমি তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত। এইরূপ যালেমদের জন্য তো কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নিশ্চিত।" (১৪/২২)

অতঃপর জাহান্নামে কাফেররা কীরূপ শাস্তি পাবে তার কিছু বিবরণ দেয়া হচ্ছে ঃ

(ক) "যে সব লোক আমাদের আয়াত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব। যখন তাহাদের দেহের চামড়া গলিয়া যাইবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিয়া দিব, যেন তাহারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকরী করার পন্থা-কৌশল খুব ভাল করিয়াই জানেন।" (৪/৫৬)

(খ) "নিশ্চিতই জানিও যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করিয়া অস্বীকার করিয়াছে এবং উহার মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের জন্য আকাশ-জগতের দুয়ার কখনই খোলা হইবে না। তাহাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র গমন। অপরাধী লোকেরা আমার নিকট এইরূপ প্রতিফলই পাইয়া থাকে।" (৭/৪০)

(গ) "অতঃপর তাহার সম্মুখের দিকে তাহার জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেখানে তাহাকে পুঁজ-রক্তের মত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে।" (১৪/১৬)

"সে উহা খুব কষ্ট করিয়া গলধঃকরণ করিতে চেষ্টা করিবে, আর খুব কমই গলধঃকরণ করিতে পারিবে। মৃত্যুর ছায়া চারিদিক হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। কিন্তু সে মরিতে পারিবে না। আর সামনে এক কঠিন আযাব তাহার উপর চাপিয়া বসিবে।" (১৪/১৭)

(ঘ) "সেই দিন (কেয়ামতের দিন) যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হইবে আর আমরা অপরাধী লোকদেরকে এমন অবস্থায় ঘিরিয়া আনিব যে, তাহাদের চক্ষু (আতংকের কারণে) প্রস্তরময় হইয়া যাইবে।" (২০/১০২)

(ঙ) "নিঃসন্দেহে তোমরা ও তোমাদের সেই সব মা'বুদ যাহাদের তোমরা পূজা উপাসনা করিতে—জাহান্নামের ইন্ধন হইবে, তোমাদেরও সেইখানেই যাইতে হইবে।" (২১/৯৮)

'ইহারা যদি প্রকৃত খোদা হইত তবে তাহারা নিশ্চয়ই সেখানে যাইত না। অতঃপর সকলকেই চিরদিন সেইখানে থাকিতে হইবে। (২১/৯৯)

"সেখানে তাহারা কানফাটা আর্তনাদ করিতে থাকিবে। আর অবস্থা এই হইবে যে, সেখানে তাহারা কোন আওয়াযই শুনিতে পাইবে না।" (২১/১০০)

(চ) "এই দুইটি পক্ষ, ইহাদের মধ্যে তাহাদের রব্ব সম্পর্কে ঝগড়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য আগুনের পোষাক কাটিয়া তৈরী করা হইয়াছে।

তাহাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢালা হইবে। (২২/১৯)

"যাহার ফলে তাহাদের চামড়াই শুধু নয়, পেটের মধ্যকার সব কিছুও গলিয়া যাইবে।" (২২/২০)

"আর তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য তৈয়ার থাকিবে লোহার গুর্জ। তাহারা যখন ভয় পাইয়া জাহান্নাম হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে তখন তাহাদেরকে ধাক্কা দিয়া পুনরায় উহার মধ্যেই ফেলিয়া দেওয়া হইবে যে, এখন জ্বলার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" (২২/২১-২২)

(ছ) "সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কাফেরদের উপর অভিশাপ করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে। সেখানে তাহারা কোন সাহায্যকারী বন্ধু পাইতে পারিবে না। (৩৩/৬৪-৬৫)

"যেদিন তাহাদের মুখমণ্ডল আগুনের উপর উল্টানো পাল্টানো হইবে, তখন তাহারা বলিবে ঃ 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্ এবং রসুলের আনুগত্য করিতাম!" (৩৩/৬৬)

(জ) "উহা এমন একটি গাছ যাহা জাহান্নামের তলদেশ হইতে বাহির হয়। উহার ছড়াগুলি এমনই, যেমন শয়তানগুলির মাথা। জাহান্নামের অধিবাসীরা উহা খাইবে এবং উহার দ্বারাই পেট ভরিবে। তাহার পর পান করার জন্য তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি দেওয়া হইবে।" (৩৭/৬৪-৬৭)

(ঝ) "যাক্কুমগাছ গুণাহগারের খাদ্য হইবে, তেলের গাদের মত পেটে এমনভাবে উথলিয়া উঠিবে, যেমন টগবগ করিয়া ফুটন্ত পানি উথলিয়া উঠে। (৪৪/৪৩-৪৬)

"ধর উহাকে এবং হেঁচড়াইয়া টানিয়া উহাকে লইয়া যাও জাহান্নামের মাঝখানে, এবং উজাড় করিয়া ঢালিয়া দাও উহার মাথার খুলির উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানির আযাব।" (৪৪/৪৭-৪৮)

"গ্রহণ কর ইহার স্বাদ। তুমি বড় সম্মানের ব্যক্তি। ইহা সেই জিনিস যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে।" (৪৪/৪৯-৫০)

(ঞ) "ধ্বংস সেই দিন সেই অমান্যকারীদের জন্য যাহারা আজ হুজ্জত-বাজিতে মাতিয়া আছে। যেদিন তাহাদিগকে ধাক্কা মারিয়া মারিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন তাহাদিগকে বলা হইবে যে, ইহা সেই আগুন যাহাকে তোমরা অসত্য ও ভিত্তিহীন মনে করিতেছিলে। (৫২/১১-১৪)

"এখন বল ইহা কি যাদু, না কি তোমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নেই? এখন যাও, উহার ভিতরে ভস্ম হইতে থাক, তোমরা তাহা সহ্য করিতে পার, আর না পার, তোমাদের জন্য সবই সমান। তোমাদিগকে সেইরকম প্রতিফলই দেওয়া হইতেছে যেমন তোমরা আমল করিতেছিলে।" (৫২/১৫-১৬)

(ট) "(তখন নির্দেশ দেওয়া হইবে) ঃ ধর লোকটিকে, উহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দাও,

অতঃপর উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। আর ইহার পর উহাকে সত্তর হাতের দীর্ঘ শিকলে বাঁধিয়া দাও। সে লোকটি না মহান আল্লাহতা'আলার প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়াইবার উৎসাহ দান করিত। এই কারণে আজ এখানে তাহার সহানুভূতিশীল সহমর্মী বন্ধু কেহ নাই; আর না আছে ক্ষত-নিঃসৃত রস ছাড়া তাহার কোন খাদ্য—নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া যাহা আর কেহই খায় না।" (৬৯/৩০-৩৭)

(ঠ) "কুফরকারীদের জন্য আমরা শিকল, কণ্ঠকড়া ও দাউ দাউ করিয়া জ্বলা আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।" (৭৬/৪)

(ড) "আহলি-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হইতে যেসব লোক কুফরী করিয়াছে তাহারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং চিরকাল তাহাতে থাকিবে। এই লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।" (৯৮/৬)

৭। কলেমা ও জিহাদ

পৃথিবীতে যতো মানবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোক আছে তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু বিশেষ পন্থা-পদ্ধতি আছে; আর আছে কিছু সাধারণ রীতি-নীতি বা আচার-অনুষ্ঠান, যার আবেদন সার্বিক বা সর্বজনীন। এই সর্বজনীন আচার-অনুষ্ঠান কমবেশী প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভিন্ন নামে প্রচলিত। এর ভেতর ইসলামের কোন বিশষত্ব নেই, বিশেষত্ব আছে তার 'কলেমা ও জিহাদে'। কলেমার অর্থ শপথ-গ্রহণ; আর জিহাদ হলো, কলেমায় যে শপথ গ্রহণ করা হলো তা বাস্তবে রূপায়িত করা। অতি সংক্ষেপে, এই কলেমা ও জিহাদ ইসলামের বিশেষত্ব; আর নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত সাধারণ আচার-অনুষ্ঠান।

কলেমা ঃ পূর্বেই বলেছি, কলেমা-পড়ার অর্থ শপথ-গ্রহণ করা। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে প্রত্যেককে শপথ নিতে হয় মোটামুটিভাবে এই বলে ঃ "আমি আল্লাহ্‌কে একমাত্র উপাস্য বলে স্বীকার করি এবং তাঁর প্রেরিত রসুল হজরত মুহাম্মদকে শেষ নবী বলে স্বীকার করি। আমি আরও স্বীকার করি যে, আল্লাহ্-প্রদত্ত কুরআনে যে-সব নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা আছে তার প্রতিটি বাণী মেনে চলবো এবং সে-সব নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সর্বপ্রকারে যত্নবান হবো।" শপথ গ্রহণের পর তাকে কার্যকরী করার জন্যে যে-কাজ করতে হবে তার নাম "জিহাদ"। কলেমা যদি ইসলামের জান হয়, জিহাদ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

জিহাদ ঃ কুরআন শরীফে আল্লাহতা'আলা এবং তাঁর রসুল মুহাম্মদ পৃথিবীর মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদকে স্বীকার করেন তারা হলেন বিশ্বাসী; আর যারা স্বীকার করেন না অর্থাৎ যারা নিজ নিজ বিশ্বাস ও পন্থ ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করেন তারা হলেন অবিশ্বাসী বা কাফের। ইহকালে তাদেরকে ইসলাম-গ্রহণে বাধ্য করার জন্যে জিহাদ ঘোষণা করা প্রতিটি মুসলমানের শুধু অবশ্য

কর্তব্যই নয়, পবিত্র কর্মও বটে। একই পথ ধরে ইসলাম গোটা পৃথিবীটাকেও দু'ভাগে ভাগ করেছে—দার-উল-ইসলাম (অর্থাৎ যে-সব দেশ বা ভূখণ্ডকে ইসলামে রূপান্তরিত করা হয়েছে), আর দার-উল-হারাব (অর্থাৎ যে-সব ভূখণ্ডের দখল নিয়ে মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলছে)। যতদিন না একপক্ষ জয়ী হবে ততদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধাবস্থা চলতেই থাকবে।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ঃ কোন্ যুক্তি বা নৈতিকতার বলে মুহাম্মদপন্থীরা অন্য পন্থীদের জোরপূর্বক নিজ পন্থে সামিল করায় প্রয়াসী হচ্ছেন বা হয়ে আসছেন? উত্তরে একটি কথাই বলতে পারি ঃ কুরআন পাঠ করে আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে বলা চলে, ইসলাম কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারে না—তারা বিশ্বাস করেন, সমস্ত পৃথিবীটাকে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্দের ভোগদখলের অধিকার দিয়েছেন। যেভাবে খুশী তারা পৃথিবীর যৎযাবতীয় ভোগ্যপণ্য ভোগ করতে পারেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদের অনুগামী ভিন্ন অন্য কারুর পৃথিবীর ধন-সম্পদে অধিকার নেই। এ-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে যদি মৃত্যু-ও হয়, তাতেও কোন ক্ষতি নেই—মৃত্যুর সাথে সাথে আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দেবেন। এ-বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, এই পুস্তকের "ইসলামের জীবন-দর্শন ভোগবাদ, ত্যাগবাদ গুণাহ্" অধ্যায়ে। তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলাম না। তবু-ও দু'একটি কথা বলার আছে। কুরআনে অসংখ্যবার ইসলামকে 'সত্য-দ্বীন' অর্থাৎ 'সত্য বিশ্বাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সব দ্বীন বা বিশ্বাসকে ঝুটা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় ঃ 'সত্য দ্বীনের' অর্থ কি কলেমা পড়ে জিহাদ ঘোষণা করা, না কি রোজা রাখা, নামাজ পড়া, হজ যাত্রা এবং জাকাত্ দান বুঝায়? আরো জানতে ইচ্ছে হয়, শেষোক্ত চারটি আচার-অনুষ্ঠান কোন্ পন্থে নেই, যা রক্ষা করার জন্যে মুহাম্মদপন্থীরা এতো মারমুখো? না কি ইসলামের আসল উদ্দেশ্য, সত্য দ্বীন বা সত্য বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে বা ধূয়া তুলে পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্যপণ্য কুক্ষিগত করার মানসে জিহাদ-নামক মোক্ষম অস্ত্রের উদ্ভাবন বা আমদানী? প্রসঙ্গক্রমে, আমরা কুরআন থেকে কিছু আয়াত তুলে ধরবো ঃ

(ক) "... (একথা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে,) তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ তাহার দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কুফ্রীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তাহার যাবতীয় কাজকর্ম নিস্ফল হইয়া যাইবে। এই ধরণের সকল লোকই জাহান্নামী হইবে এবং চিরদিন জাহান্নামেই অবস্থান করিবে।" (২/২১৭)

"পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যাহারা খোদার জন্য ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়াছে, এবং খোদার পথে জিহাদ করিয়াছে, তাহারাই খোদার অনুগ্রহ লাভের আশা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। আল্লাহ্ তাহাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করিবেন এবং নিজের অনুগ্রহ দানে তাহাদিগকে ধন্য করিবেন।" (২/২১৮)

(খ) "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন।" (৪২/৭)

আমাদের সংযোজন ঃ এই আয়াতটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বয়ং আল্লাহ্ যেখানে সর্বশক্তিমান সেখানে তাঁকে সাহায্য করার কথা আসে কীভাবে? তবে হ্যাঁ, তিনি এবং তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদ যদি অভিন্ন সত্তা হন এবং রসুলকে সাহায্য করার অর্থই যদি আল্লাহ্‌কে সাহায্য করা বুঝায় সেক্ষেত্রে আর কোন গোলমাল থাকে না। তবু-ও একটি প্রশ্ন থেকে যায় ঃ যেখানে আল্লাহ্'জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জাগতিক জীবনের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন' সেখানে তাঁর রসুলের তরফ থেকে 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য কর' এই সর্তটি আরোপ করা হলো কেন?

(গ) "যাহারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ্ ও রসুলের আহ্বানে সারা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত পুণ্যশীল, নেককার ও পরহেযগার তাহাদের জন্য অত্যধিক সুফল রহিয়াছে।" (৩/১৭২)

(ঘ) "(এই সব লোকের জানিয়া রাখা উচিত যে) খোদার পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যাহারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করিয়া দেয়। যাহারা খোদার পথে লড়াই করিবে ও নিহত হইবে, কিংবা বিজয়ী হইবে, তাহাকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করিব।" (৪/৭৪)

(ঙ) "যেসব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসিয়া থাকে, আর যাহারা খোদার পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহতা'আলা বসিয়া থাকা লোকদের অপেক্ষা জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রাখিয়াছেন; ইহাদের প্রত্যেকের জন্য যদিও কল্যাণেরই ওয়াদা রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণকর কাজের ফল বসিয়া-থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী।" (৪/৯৫)

(চ) "আর সেই সময়ের কথাও, যখন তোমাদের খোদা ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করিয়া বলিতেছিলেন ঃ 'আমি তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছি, তোমরা ঈমানদারদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাখ, আমি এখনই এই কাফেরদের দিলে ভীতির উদ্রেক করিয়া দিতেছি। অতএব তোমরা তাহাদের ঘাড়ের উপর আঘাত হান এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও'।" (৮/১২)

(ছ) "হে নবী, মু'মিন লোকদিগকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন লোক যদি ধৈর্যশালী হয় তবে তাহারা দুই শতের উপর জয়ী হইবে। আর যদি একশত লোক এইরূপ থাকে তাহা হইলে সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে। কেননা উহারা এমন লোক, যাহারা জ্ঞান রাখে না।" (৮/৬৫)

(জ) "তোমরা যদি যুদ্ধ-যাত্রা না কর, তাহা হইলে তোমাদের পীড়া-দায়ক শাস্তি দান করা

হইবে এবং তোমাদের স্থলে অপর কোন লোকসমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, তোমরা খোদার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার।" (৯/৩৯)

(ঝ) "হে নবী, কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাহাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। শেষ পর্যন্ত তাহাদের পরিণতি হইতেছে জাহান্নাম; আর তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।" (৯/৭৩)

(ঞ) "প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহতা'আলা মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের হৃদয়-মন এবং তাহাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাহাদের প্রতি (জান্নাত-দানের ওয়াদা) খোদার যিম্মায় একটি পাকা পোখ্ত ওয়াদা তওরাত ইনজীল ও কুরআনে। আর খোদার অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশী পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-ক্রিয়রের দরুন, যাহা তোমরা খোদার সহিত সম্পন্ন করিয়াছ। ইহাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।" (৯/১১১)

(ট) "আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদিগকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করিয়া লইয়াছেন। আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা চাপাইয়া দেন নাই। তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ্ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলীম' রাখিয়াছিলেন, আর এই (কুরআনে) ও (তোমাদের এ-ই নাম), যেন রসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে শক্তভাবে ধারণ কর।..." (২২/৭৮)

(ঠ) "অতএব হে নবী, কাফের লোকদের কথা কস্মিনকালেও মানিও না, আর এই কুরআনকে লইয়া তাহাদের সহিত বড় জিহাদ কর।" (২৫/৫২)

(ড) "অতএব এই কাফেরদের সহিত যখন তোমাদের সম্মুখ সংঘর্ষ হইবে তখন প্রথম কাজই হইল গলাসমূহ কর্তন করা। ....আর যে-সব লোক আল্লাহ্র পথে নিহত হইবে আল্লাহ তাহাদের আমলসমূহকে কক্ষণই নষ্ট ও ধ্বংস করিবেন না।" (৪৭/৪)

(ঢ) "অতএব তোমরা সাহসহীন হইয়া পড়িও না এবং সন্ধি সমঝোতার আবেদন করিয়া বসিও না। আসলে তোমরাই বিজয়ী হইয়া থাকিবে। আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন এবং তোমাদের আমল তিনি কক্ষণই বিনষ্ট করিবেন না।" (৪৭/৩৫)

(ণ) "আল্লাহ্তো ভালবাসেন সেই লোকদিগকে যাহারা তাঁহার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হইয়া লড়াই করে যেন তাহারা ইস্পাত-নির্মিত প্রাচীর।" (৬১/৪)

(ত) "হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর এবং তাহাদের সহিত কঠোর নীতি প্রয়োগ কর। তাহাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নামে এবং পরিণতি হিসাবে উহা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান।" (৬৬/৯)

জিযিয়া কর ও জিম্মীর জীবন-যাপন

(থ) "যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের দিনের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ ও তাঁহার রসুল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে হারাম করে না, এবং সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না। (তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাক) যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হইয়া থাকিতে প্রস্তুত হয়।" (৯/২৯)

আমাদের সংযোজন ঃ এই আয়াতটির একটু বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। কারণ, এই আয়াতে উল্লিখিত 'নিজ হাতে জিযিয়া দিতে ও ছোট হইয়া থাকিতে' বাক্যাংশটি অ-মুসলমানদের প্রতি চূড়ান্ত অপমানজনক বক্তব্যরূপে কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে। জিযিয়া একপ্রকারের কর যা একমাত্র অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা না হয় হলো, নিজেদের হাতে দিতে হবে কেন? কারণ একটিই, মুসলমান না-হওয়ার অপমানকর শাস্তি! জিযিয়া কর তো দেয়া হলো এবং নিজ হাতেই দেয়া হলো। তাতেও মুসলীম দেশে বসবাস করার অধিকার জন্মায় না কাফরদের, যদি না তারা 'ছোট হইয়া থাকিতে প্রস্তুত থাকে'। কীভাবে ছোট হয়ে থাকতে হবে, তার বর্ণনা একটু পরেই দিচ্ছি। এ-ভাবে যারা জীবন-যাপন করে তাদেরকে 'জিম্মী' বলে। এখন শর্তাবলী শুনুন ঃ

১) কাফেররা নতুন করে কোন উপাসনা-গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না;

২) মুসলমানরা কাফেরদের যে-সব উপাসনা-গৃহ ধ্বংস করেছে সে-সব গৃহ আর পুণর্নির্মান করা যাবে না;

৩) কোন মুসলমান ভ্রমণকারী যদি কাফেরদের কোন উপাসনাগৃহে সাময়িকভাবে থাকতে চায় তবে তাতে আপত্তি করা চলবে না;

৪) যদি কোন মুসলমান তাদের গৃহে থাকতে চায় তবে তাকে তিন দিন পর্যন্ত থাকতে দিতে হবে; পরন্তু সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে দিতে হবে;

৫) মুসলমানদের প্রতি তারা কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করবে না এবং তাদের বিপক্ষবাদীদের কোনরূপ সাহায্য করবে না;

৬) তাদের মধ্য থেকে কাউকে ইসলাম-পন্থে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না;

৭) তারা মুলসমানদের প্রতি সম্মানসূচক আচরণ করবে;

৮) তাদের গোপন সভায় মুসলমানরা থাকতে চাইলে থাকতে দিতে হবে;

৯) তারা মুসলমানদের অনুরূপ পোষাক পরিধান করতে পারবে না;

১০) মুসলমানী নাম অনুকরণ করে নিজেদের নামকরণ করতে পারবে না;

১১) তারা গদি-আঁটা এবং লাগাম লাগানো ঘোড়ায় চড়তে পারবে না;

১২) কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র রাখতে বা বহন করতে পারবে না;

১৩) মোহরাঙ্কিত কোন আংটি তারা আঙ্গুলে ধারণ করতে পারবে না;
১৪) খোলা জায়গায় মদ্যপান বা বিক্রয় করতে পারবে না;
১৫) তারা এমন ধরনের পোষাক পরিধান করবে তা দেখলেই যেন বুঝা যায়, তারা নিম্নস্তরের এবং মুলসীম থেকে পৃথক শ্রেণীর মানুষ;
১৬) তাদের আচার-আচরণ, প্রথা প্রভৃতি মুসলীমদের মধ্যে প্রচার করতে পারবে না;
১৭) মুসলমানদের বাড়ীর সন্নিকটে নিজেদের বসতবাড়ী নির্মাণ করতে পারবে না;
১৮) মুসলীমদের কবরস্থানের ধারেকাছেও তাদের মৃতদেহ নেয়া চলবে না;
১৯) তারা তাদের পন্থীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে করতে পারবে না এবং তাদের শোকতাপ উচ্চস্বরে প্রকাশ করতে পারবে না; এবং
২০) তারা কোন মুসলীম ক্রীতদাসকে ক্রয় করতে পারবে না। (Pan Islamism Rolling Back by Sri P. N. Joshi, pages 142-143 থেকে উদ্ধৃত)।

৮। জিহাদ ও মালে গণীমত

কলেমা থেকে যেমন জিহাদকে ভিন্ন করা যায় না, ঠিক তেমনি জিহাদ থেকেও 'মালে গণীমতকে' বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব অর্থহীন। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জিহাদের উদ্ভাবন এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জিহাদ-লব্ধ 'মালে গণীমত' মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ হালাল (অনুমোদিত) করে দিয়েছেন। মালে গণীমতের অর্থ হলো, যুদ্ধে পরাজিত কাফেরদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, যার মধ্যে আছে পুরুষ, নারী, গৃহপালিত পশু এবং নগদ ধনরত্ন। এবার কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ

(ক) "আর তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমরা যে গণীমতের মাল লাভ করিয়াছ উহার এক পঞ্চম অংশ আল্লাহ্, তাঁহার রসুল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট; ...." (৮/৪১)। বাকী চারভাগ পাবে মুজাহিদরা অর্থাৎ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করবে তারা।

(খ) "অতএব তোমরা যাহা কিছু ধন-মাল লাভ করিয়াছ তাহা খাও; উহা হালাল (অনুমোদিত) এবং পাক (পবিত্র)। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল।" (৮/৬৯)

অনুবাদকের টীকা ঃ এই আদেশ অনুসারে মুসলমানগণ বদরে (এখানে বদর-যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে) যে মালে গণীমত (যুদ্ধলব্ধ ধন) লাভ করেছে সেকথা বলা হয়েছে।

(গ) "এতদ্ব্যতীত আরও বহু গণীমতের সামগ্রী তাহাদিগকে দিলেন, যাহা তাহারা (শীঘ্রই) অর্জন করিবে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।" (৪৮/১৯)

অনুবাদকের টীকা ঃ এখানে খয়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) "আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিপুল সংখ্যক গণীমতের ধন-সম্পদ দান করিবার ওয়াদা করিতেছেন যাহা তোমরা অবশ্যই লাভ করিবে।" (৪৮/২০)

অনুবাদকের টীকা ঃ খয়বরের পর অন্যান্য যে সমস্ত বিজয় মুসলমানরা ক্রমাগত লাভ করিতে থাকে এখানে সেই সবকে বুঝানো হয়েছে।

(ঙ) 'ইহা ছাড়া আরও অনেক গণীমত দেওয়ারও তিনি তোমাদের নিকট ওয়াদা করিতেছেন যাহা অর্জন করিতে তোমরা এখন পর্যন্ত সক্ষম হইতে পার নাই। আর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্তো সব কিছুর উপরই শক্তিমান।" (৪৮/২১)

অনুবাদকের টীকা ঃ খুব সম্ভব এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ঈশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো মক্কা তোমাদের অধীনস্থ হয়নি কিন্তু আল্লাহ্ তাকে নিজ বেষ্টনীতে নিয়েছেন এবং হোদাই বিয়ার এই জয়ের ফলস্বরূপ মক্কাও তোমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে।

৯। ইসলাম কি আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক, যার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং হজরত মুহাম্মদ?

আমরা সবাই জানি, ইসলাম-পন্থের প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ। কিন্তু তিনি যে আরব জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদেরও প্রবর্তক তা আমরা জানি না। কুরআন এবং হাদীস থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এ-তত্ত্বটি আমাদের জানিয়েছেন ইসলামেরই একজন বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ জনাব আনোয়ার শেখ, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ISLAM, THE ARAB IMPERIALISM" গ্রন্থে। তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি।

(a) "In fact, Islam is based on the racial pride of Prophet Muhammad, who wanted to exalt the Arabs over the Jews. For sake of convenience, I re-quote the hadith : 'Of the two tribes that God chose as the best were the descendants of Ishmael and Isaac, God preferred the children of Ishmael (Arabs) to the children of Isaac (the Jews) : Then, God created Muhammad in the chosen tribe of Quresh (the descendants of Ishmael) and then He chose the best family among the Quresh and created Muhammad as the best of men." (Jame Tirmize, vol. 2)

"Since every word of this hadith emits the national pride of Muhammad, it is difficult to imagine that Islam can have any purpose other than serving the cause of Arabia. When we look into it

more carefully, it transpires that Islam represents a narrow concept of nationalism, which restricts the right of governing to the Quresh, that is, the Prophet's clan only :
(b) "May Allah destroy those who intend to humiliate the Quresh." (Jame Tirmize, vol. 2)
(c) ".....the prerogative to rule shall remain vested in the Quresh, and whoever is hostile to them, Allah shall destroy him..." (Sahih Bokhari, vol. 4)
(d) "The right to rule shall belong to the Quresh even if two men existed." (Bokhari, vol. 4) Ibid-pages 104-05.

এখন শোনা যাক, মক্কা এবং আরবের প্রতি পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ কীরূপ মনোভাব পোষণ করতেন।

(a) "That the Prophet was a staunch believer of Arab nationalism, is confirmed by his extreme love for Mecca i.e., Arabia, his home-land : The Prophet said, 'O Mecca, by Allah you are better than any part of the earth, and dearer to me than the rest of the world'. (Jame Tirmige, vol.2) Ibid p. 105.
(b) "He who aggresses against Arabia, shall not win my love, nor will I intercede for him." (Jame Tirmige, vol. 2) Ibid-p. 105.
(c) "The hadith no 5751 (Mishkat, vol. 3) reports the Prophet saying, 'Love the Arabs for three reasons because; (i) I am an Arab; (ii) The Holy Koran is in Arabic and (iii) the tongue of the dwellers of Paradise shall also be Arabic'. (Ibid page 113)
(d) "Ibne Majah reports in Hadith no. 1463, that a Namaz i.e., prayer in the Mosque-in-Madina brings 100 times more blessings than a similar prayer in other mosques, and a prayer in the Kaaba invokes 100,000 benedictions compared to a similar worship in other mosques!" (Ibid p. 113)
(e) "It is a part of the Islamic faith that every Muslim, no matter where he lives, must come to Mecca for pilgrimage, at least once in a life time, provided he has the means to do so." (Ibid p. 114)

হাদীস শরীফ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া গেলো। এবার কুরআন শরীফ থেকে কিছু আয়াত

উদ্ধৃত করবো।

(ক) "(হে নবী! ইহাদিগকে বল) আমাকে তো এই নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে যে, আমি এই শহরের (মক্কার) রব্বের বন্দেগী করিব যিনি ইহাকে হেরেম বানাইয়াছেন...." (২৭/৯১)

(খ) "হে নবী! লোকদের বলিয়া দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই খোদার প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমাকে অনুসরণ কর; তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের ভাল বাসিবেন এবং তোমাদের গুণাহ মাফ করিয়া দিবেন।...." (৩/৩১)

(গ) "এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা (আরবরা)... তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হইতে লোকদের বিরত রাখ...' (৩/১১০)

(ঘ) "এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! আমরা উহাকে আরবী ভাষায় কিতাব বানাইয়াছি, যেন তোমরা উহা বুঝিতে পার।" (৪৩/২-৩)

উপরে উদ্ধৃত হাসীস ও কুরআনের আয়াতসমুহ থেকে একটি বিষয় বেশ ভালভাবে বুঝা যাচ্ছে, কোরেশ বংশ ও আরব দেশের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের মধ্যে কোনরূপ মতপার্থক্য ছিল না। শুধু তাই নয়, ৩/৩১ নম্বর আয়াতে হজরত মুহাম্মদের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও স্বীকার করা হয়েছে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠে আসবে, ইসলাম-প্রসঙ্গ আলোচনায় বসে কোরেশ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আরব জাতীয়তাবাদ তথা আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গ টেনে আনার মধ্যে কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে কি? অবশ্যই আছে। এখানে প্রধান বিচার্য বিষয় ঃ আল্লাহতা'আলা হজরত মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছিলেন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে, না কি হজরত মুহাম্মদ ইসলামকে কাজে লাগিয়েছিলেন আরব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে? এ-প্রশ্নের উত্তর জনাব আনোয়ার শেখের ভাষায় শুনুন। তিনি বলছেন ঃ "Owing to its deep-rooted tendencies to benefit the Arabs at the expense of its followers belonging to the foreign lands, it is reasonable to conclude that the Islam is nothing but the tool of the Arab Isperialism." (Ibid p.5)

বুঝা গেলো, আরব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে 'ইসলাম'কে একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে এমন কী আছে যার জন্যে এর প্রতিষ্ঠা এতো সহজ হয়েছে? এ বিষয়ে আল্লাহ বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর সৃষ্ট মানুষের মন কোথায় কীভাবে কাজ করছে বা করে তার বিশদ সংবাদ স্বয়ং আল্লাহতা'আলা ব্যতীত আর কার পক্ষে জানা সম্ভব? তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু বুঝেন। তাই তিনি মানব-মনের সবচেয়ে দুর্বলতম কক্ষটিতে আঘাত করলেন—উস্কিয়ে দিলেন তার ভোগাকাংখাকে দু'ভাবে, যাতে সর্বসাধারণ খুব সহজেই সে-জালে ধরা দেয় বা ধরা পড়ে। এক, জাগতিক জীবনে ইসলাম বা মুহাম্মদপন্থীদের অনুমতি দিলেন, জিহাদলব্ধ 'মালে গণীমত' আত্মসাত করার; আর দুই, মৃত্যুর পর 'রোজ কেয়ামতে' অর্থাৎ

শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেক মুসলমানকে জান্নাত-দানের ওয়াদা (Promise of Paradise) করলেন। একেই কুরআনে বলা হয়েছে 'জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্ প্রত্যেক মু'মিন অর্থাৎ মুসলমানের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন'। আল্লাহ্র তরফ থেকে এটি একটি পাক্কা ওয়াদা যা প্রতিটি মুসলমান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করে পৈশাচিক উল্লাসে কাফের-নিধনে লিপ্ত হন এবং অকাতরে শাহাদাত বরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। কারণ, আল্লাহ্র ওয়দামত (যাঁর ওয়াদা কখনই খিলাপ হবার নয়) মুসলমানদের ইহজগতে কিংবা পরজগতে হারাবার কিছু নেই। এখানে আছে জিহাদ-লব্ধ মালে গণীমত, সেখানে আছে জান্নাত-প্রাপ্তি। এবার আনোয়ার শেখের ভাষায় শুনুন ঃ "In fact, Islam is the most effective tool of imperialism; other nations, usually acquire political and cultural glory through economic power or sword and fire, but Islam achieves this aim through the medium of faith-in-Muhammad, the only source of paradise, replete with beautiful virgins, pretty boys and rivers of wine, milk and honey. This lure of paradise has turned all non-Arab Muslims into moths, eager to cremate themselves on the flame of the Arabian cultural hegemony." (Ibid-p.4)

অতঃপর আমাদের একটু পেছনের দিকে ফিরে যেতে হবে। সময়টা হজরত মুহাম্মদের নবুয়াত-প্রাপ্তির (Acquiring of Prophethood) দশম কি একাদশ বছর হবে। সবেমাত্র তাঁর নবলব্ধ দ্বীন প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সমাজের অর্থাৎ কোরেশ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মুহাম্মদের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিলেন। কারণ, তখন মক্কার অধিবাসীরা সবাই ছিলেন পৌত্তলিক। এমন কি সেদিনের কাবাগৃহে অসংখ্য দেব-দেবীর নিয়মিত পূজা হতো। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ছিলেন এর বিপরীত। তাই সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই সংঘাত ক্রমান্বয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছিল যে নিজ বংশ কোরেশের লোকজন হজরত মুহাম্মদকে প্রাণে মারার পর্যন্ত হুমকি দিয়েছিল। এমতাবস্থায় কোরেশ জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্থির করলেন যে মুহাম্মদের চাচা আবু তালীবের কাছে যেয়ে শেষবারের মতো তাঁকে বলে আসবেন, মুহাম্মদ যেন তাদের বিশ্বাসের উপর বিনা কারণে আঘাত না হানে। আবু তালীব তখন মৃত্যু-শয্যায়। সেই সময় মুহাম্মদ তাঁর সাথেই বাস করতেন এবং আবু তালীবই ছিলেন অভিভাবক। তাই কোরেশ সর্দাররা আবু তালীবের মধ্যস্থতার আশায় তাঁর শরণাপন্ন হলেন। এর পরের বৃত্তান্ত শুনুন তরজমা-এ-কুরআন মজীদের অনুবাদকের ভাষায়। 'সুরা-সাদ'-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেনঃ "ঈমাম আহমদ্, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে জরীর, ইবনে আবু শাইবা, ইবনে আবু হাতিম ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ পর্যায়ে যে-সব হাদিস বর্ণনা করেছেন, তার

সার কথা হ'ল এই যে, আবু তালিব যখন রোগাক্রান্ত হলেন, কুরাইশ সর্দাররা অনুভব করলো যে, এটাই তার শেষ সময়। সুতরাং তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে সব বিষয়ে কথাবার্তা বলা আবশ্যক মনে করলো ঃ তার ভাইপো ও আমাদের মধ্যে যে বিবাদটি রয়েছে তার মীমাংসা করে দিলে তো ভালই হয়। নতুবা তার মৃত্যু ঘটে যাওয়ার পর আমরা যদি মুহাম্মদ-এর সাথে কোন শক্ত ব্যবহার করি তখন আরবের লোকেরা আমাদের মন্দ বলবে। বলবে যে, যতদিন শায়খ জীবিত ছিল ততদিন তো তার খেয়াল রাখা হয়েছে, আর এখন যখন সে মরে গেছে, তখন লোকেরা তার ভাইপোর উপর আঘাত হেনেছে। একথায় সকলেই একমত হ'ল। আর প্রায় ২৫ জন কুরাইশ সর্দার—আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া ইব্‌নে খালফ, আ'স ইব্‌নে অয়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, উকবা ইব্‌নে আবু মুআয়ত, উতবা ও শাইবা প্রমুখ তার নিকট উপস্থিত হ'ল। তারা প্রথমে তো হয়রত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু সাধারণ অভিযোগ পেশ করলো। তারপর বলল ঃ আমরা আপনার নিকট ইনসাফের কথা পেশ করবার জন্য এসেছি। আপনার ভাইপো আমাদেরকে আমাদের দ্বীনে থাকতে দিক। আমরা তাকে তার দ্বীনের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে যে মা'বুদের ইবাদত করতে চায় করতে পারে। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই; কিন্তু সে যেন আমাদের মা'বুদদের মন্দ বলা ত্যাগ করে। আর আমরা আমাদের মা'বুদদের ত্যাগ করব—সেজন্য যেন সে চেষ্টা না করে। এ শর্তে আপনি আমাদের ও তার মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালিব নবী করিম (সঃ)-কে ডেকে পাঠাল এবং তাঁকে বলল ঃ 'ভাইপো! তোমার জাতির এই লোকেরা আমার নিকট এসেছে। তারা চায়, তুমি একটি ইনসাফপূর্ণ কথায় তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, যেন তোমার ও তাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ না থাকে, যা আছে তা যেন শেষ হয়ে যায়।' অতঃপর কুরাইশ সর্দাররা যা বলেছিল, সে তা তাঁকে জানালো। নবী করীম (সঃ) জওয়াবে বললেন ঃ চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটি কলেমা পেশ করেছি, যা এরা মেনে নিলে সমস্ত আরব এদের আদেশানুগামী ও অনারব দেশ এদের অধীন হয়ে যাবে।

"এ বর্ণনাগুলোর শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। এর অর্থ নবী করীম (সঃ) তাদেরকে বললেন ঃ আমি যদি এমন একটি কথা তোমাদের সামনে পেশ করি, যা কবুল করে তোমরা সমস্ত আরব ও অনারবের মালিক হয়ে বসতে পারবে, তবে বল ঃ তাই অতি উত্তম কিনা? না সেটি ভাল, যা তোমরা ইনসাফের দোহাই দিয়ে আমার সামনে পেশ করছো? তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ এই কলেমাকে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত, না তাতে যে, তোমরা যে অবস্থায় পড়ে আছ তাতেই তোমাদেরকে পড়ে থাকতে দেয়া হবে, আর নিজের মত নিজের জায়গায় নিজের খোদার বন্দেগী করতে থাকবে?" (কুরআন মজীদ পৃষ্ঠা ৭৭৫-৭৭৬)

উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হলো। কিন্তু উপায় নেই। কারণ, আরব সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামের

মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে তা বুঝবার এবং বুঝাবার জন্যে এই উদ্ধৃতিটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। নতুবা পর্বত-প্রমাণ ভুল বুঝা-বুঝির অবকাশ থাকতো। হজরত মুহাম্মদ এখানে 'কলেমা' বলতে কী বুঝায়, তা তিনি আকার ইঙ্গিতে অনেকটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন; তবুও পরিস্কারভাবে কিছু বুঝা যায় না। তাই পাঠকের কাছে আমাদের অনুরোধ, 'কলেমা' বলতে ইসলামে কী বুঝায় তা বিস্তারিত জানার জন্যে এই পুস্তকের 'কলেমা ও জিহাদ' অধ্যায় দেখুন।

১০। হজরত মুহাম্মদ কি শেষ নবী এবং কুরআন শেষ কীতাব?

মুসলমানরা বলে থাকেন, হজরত মুহাম্মদই শেস নবী এবং কুরআনই শেষ কীতাব। এরপর আর কোন নবী আসবেন না এবং নতুন করে কোন কীতাবও আল্লাহ পাঠাবেন না। কিন্তু কুরআন শরীফ পাঠ করতে যেয়ে এ দু'টি বিষয়ে আমাকে এমন কয়েকটি আয়াতের সম্মুখীন হতে হয়েছে যাতে আপাতঃদৃষ্টিতে বিপরীতমুখী বলে মনে হয়েছে। আয়াত ক'টি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

৩৩/৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, " (হে জনগণ!) মুহাম্মদ, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নয়, বরং আল্লাহ্‌র রসুল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।"

আবার ১৩/৩৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমাদের পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক নবী-রসুল পাঠাইয়াছি এবং তাহাদিগকে আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন সম্পন্ন বানাইয়াছিলাম। ... প্রত্যেক যুগের জন্যই একখানি কিতাব রহিয়াছে।"

"সীরাতুন নবী"-গ্রন্থেও এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। গ্রন্থকার লিখছেন, "হুযুর (সাঃ) -এর চারজন পুত্রসন্তান এবং চারজন কন্যার মধ্যে একমাত্র হযরত ফাতেমা ছাড়া অন্য সবাই শৈশবে বা যৌবনে তাঁরই সামনে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন"। (সীরাতুন নবী-পৃষ্ঠা ৬০৫)।

এরপর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত পাঠকের সামনে তুলে ধরবো (৩/৮১) যা পাঠ করলে মনে হবে, হজরত মুহাম্মদের পরও নবী আসবেন এবং কুরআনের মতো কিতাবও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। আয়াতটি ভালভাবে অনুধাবন করলে মনে হবে, হজরত মুহাম্মদ শেষ নবী নন এবং কুরআন শরীফ-ও শেষ কিতাব নয়। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

"স্মরণ কর, খোদা নবীদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে, আজ আমি তোমাদিগকে কিতাব ও বিজ্ঞান, কর্মকৌশল ও বুদ্ধি দিয়া ধন্য করিয়াছি। কাল অপর কোন নবী তোমাদের নিকট ঠিক সেই শিক্ষা লইয়াই যদি আসে যাহা তোমাদের নিকট পূর্ব হইতেই বর্তমান আছে তবে তাঁহার প্রতি তোমাদের ঈমান আনিতে হইবে এবং তাহার সাহায্য করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ তোমরা কি ইহার অঙ্গীকার করিতেছ এবং এসম্পর্কে আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব লইতে

প্রস্তুত আছ? তাহারা বলিল ঃ হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করিতেছি। আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।''

এর পরের আয়াতেই (৩/৮২) বলা হয়েছে, যে নবী এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সে-ই ফাসেকরূপে গণ্য হইবে। কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ 'ইহার পর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে সে-ই ফাসেক।''

উপরে উদ্ধৃত ৩৩/৪০, ১৩/৩৮ এবং ৩/৮১ আয়াত ক'টি পরার পর পাঠককে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়, এবং তার পক্ষে কোনভাবেই এরূপ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে, হজরত মুহাম্মদই শেষ নবী এবং কুরআনই শেষ কিতাব। পাঠক হিসেবে আমার এ-ধারণা যদি ঠিক বলে মনে না হয়, তবে কোন মোল্লা বা মৌলবী সাহেব এব্যাপারে সাহায্য করলে ভাল হয়।

তদুপরি আমার মনে আরও একটি প্রশ্ন জেগেছে ঃ 'শেষ কথা' বলে বিশ্ববিধানে কোন কিছু আছে কি? স্বয়ং আল্লাহ্ যিনি সারা জাহানের মালিক, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান তিনিই কি তাঁর কথা ঠিক রাখতে পেরেছেন? মাক্কী জীবনে হজরত মুহাম্মদের নিকট যে-সব নির্দেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন, মদনি-জীবনে সে-সব নির্দেশের কি আমূল পরিবর্তন তিনি ঘটান নি? উদাহরণ স্বরূপ মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। মাক্কীজীবনে হজরত মুহাম্মদের নিকট আল্লাহর একটি নির্দেশ ছিল এরূপ ঃ তুমি তোমার বংশের লোকদের বল, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন দ্বন্দ্ব নেই—তোমরা তোমাদের দ্বীন (বিশ্বাস) নিয়ে বসবাস কর, আমাকেও আমার দ্বীন নিয়ে থাকতে দাও।' কিন্তু নবুয়ত-প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বৎসরে হজরত মুহাম্মদকে যখন মক্কা থেকে মদিনায় প্রাণের ভয়ে চলে আসতে হলো এবং অনতিবিলম্বেই মুহাম্মদ যখন নিজের পায়ের তলার শক্ত মাটি খুঁজে পেলেন অর্থাৎ নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি মদিনায় প্রাতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন তখনই আল্লাহ্ হজরত মুহাম্মদকে নির্দেশ দিলেন, ''হারাম মাস যখন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাহাদের পাও''; (৯/৫)

আল্লাহ্র তরফ থেকে পূর্বোক্ত দু'রকমের নির্দেশ আসার কারণ হিসেবে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছে তা এরূপ ঃ সবাইকে, এমন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকেও সময় এবং পরিস্থিতির সাথে তাল রেখে চলতে হয় অর্থাৎ স্থান কাল পরিবর্তনের সাথে সাথে সার্বিকভাবে চিন্তাভাবনা ও কর্মপন্থারও পরিবর্তন ঘটাতে হয়। একথা স্বয়ং আল্লাহতা'আলার চেয়ে আর কে ভাল জানতেন বা জানেন। তাই মাক্কী জীবনে আল্লাহ্ তাঁর রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন নিজেকে একজন সাবধানকারী বলে পরিচয় দেন; কিন্তু যেই মাত্র হজরত মুহাম্মদ মদনি জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন, অমনি আল্লাহ্র নিকট থেকে নির্দেশ এলো ঃ যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদের বিরুদ্ধে যেন তিনি জিহাদ ঘোষণা করে বুঝিয়ে দেন, তাদের প্রতি হজরত মুহাম্মদ কতো কঠোর হতে

পারেন। সুতরাং আল্লাহ্ মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে (হজরত মুহাম্মদ নবুয়ত-প্রাপ্তির পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন) যদি তাঁর মত পাল্টাতে পেরে থাকেন অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে পেরে থাকেন, তবে দীর্ঘ ১৪০০ বছর পর ইসলাম বা মুহাম্মদপন্থীরা ভেবে দেখতে পারেন, তাদের পন্থ্ বা বিশ্বাসকে সময়োপযোগী করে তোলা যায় কিনা।

১১। কুরআনে বর্ণিত আয়াত-সমূহের মধ্যে কি কোন প্রকার অসঙ্গতি কিংবা বৈপরীত্য আছে?

প্রশ্নটি আমার নয়—খোদ খোদাতাল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসেছে। তিনি বলছেন ঃ "ইহারা কি কোরআন গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? ইহা যদি খোদা ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিত তবে ইহাতে অনেক কিছুই বর্ণনা-বৈষম্য (ও কথার পার্থক্য) পাওয়া যাইত।" (৪/৮২)

এখন দেখা যাক, নিম্নে উদ্ধৃত আয়াত সমুহের মধ্যে কোনরূপ বর্ণনা-বৈষম্য ও পার্থক্য আছে কিনা। বিচারের ভার পাঠকের।

(ক) "হে মুসলমানগণ! তোমরা বল যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্‌র প্রতি ও আমাদের জন্য যে জীবন-ব্যবস্থা নাযিল করিয়াছে তাহার প্রতি এবং যাহা ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাবিল হইয়াছে তাহার প্রতি; যাহা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীকে তাহাদের খোদার তরফ হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতি। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত।" (২/১৩৬)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি-কিতাব হইতে যাহারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রুপ ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে এবং অপরাপর কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাইও না।...." (৫/৫৭)

(খ) "আমরা খোদার রসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনিয়াছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মানিয়া লইয়াছি।...." (২/২৮৫)

"......আমরা কোন কোন নবী-পয়গম্বরকে অপর নবী-পয়গম্বরের উপর অধিক মর্যাদা দিয়াছি।....." (১৭/৫৫)

(গ) "হে ঈমানদার লোকেরা, শরাব (মদ্য) জুয়া ও এই আস্তানা ও পাশা—এ সবই নাপাক শয়তানী কাজ। তোমরা ইহা পরিহার কর।....." (৫/৯০)

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাক তখন নামাযের কাছেও যাইও না।...." (৪/৪৩)

(ঘ) "পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র। যে দিকেই তুমি মুখ ফিরাইবে সেদিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশালতাসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ।" (২/১১৫)

"তুমি যে স্থান হইতে চলনা কেন, সেস্থান হইতেই নিজের মুখ (নামাযের সময়) মসজিদে হারামের দিকে ফিরাও। কেননা ইহাই তোমার খোদার সম্পূর্ণ সত্যভিত্তিক ফয়সালা এবং আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্মে মোটেই বে-খবর নহেন।" (২/১৪৯)

(ঙ) "যেমন (এই দিক দিয়া তোমরা কল্যাণ লাভ করিয়াছ যে,) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন রসুল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদিগকে আয়াত পড়িয়া শুনায়; তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করিয়া তোমাদিগকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দেয়।" (২/২৫১)

"(হে নবী!) তুমি ইহার পূর্বে কোন কিতাব পড়িতে না, নিজের হাত দিয়াও কিছু লিখিতে না। যদি তাহাই হইত তবে বাতিল-পন্থীরা সন্দেহে পড়িয়া যাইতে পারিত।" (২৯/৪৮)

(চ) "তোমার পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক নবী-রসুল পাঠাইয়াছি এবং তাহাদিগকে আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসম্পন্ন বানাইয়াছিলাম।....." (১৩/৩৮)

"(হে জনগণ!) মুহাম্মদ, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নয়, বরং আল্লাহ্র রসুল সর্বশেষ নবী।....." (৩৩/৪০)

(ছ) "নিশ্চয় জানিও, আরবীয় নবীর প্রতি বিশ্বাসী হউক, কিংবা ইহুদি, খৃষ্টান হউক বা সাবী—যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিবে ও সৎকাজ করিবে, সে তাহার পুরস্কার তাহার খোদার নিকট পাইবে এবং তাহার জন্য কোনপ্রকার ভয় ও চিন্তার কারণ থাকিবে না।" (২/৬২ এবং ৫/৬৯)

".....অতএব (হে ইয়াহুদী সমাজ) তোমরা লোকদের ভয় করিও না, আমাকে ভয় কর, এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগণ্য বিনিময় লইয়া বিক্রয় করা পরিত্যাগ কর, যাহারা খোদার নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তাহারাই কাফের।" (৫/৪৪)

(জ) "........ আর তাহাদিগকে বল ঃ 'আমরা ঈমান আনিয়াছি সেই জিনিষের প্রতি যাহা আমাদের প্রতি পাঠানো হইয়াছে এবং সেই জিনিসের প্রতিও যাহা তোমাদের প্রতি পাঠানো হইয়াছিল। আমাদের খোদা আর তোমাদের খোদা একই এবং আমরা তাহারই মুসলিম (অনুগত)।" (২৯/৪৬)

'ইহার পূর্বে আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছি। অতএব উহা লাভ করা সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এ কিতাবকে আমরা বনী-ঈসরাইলের জন্য হেদায়াতের বিধান বানাইয়াছিলাম।" (৩২/২৩)

'অথচ আমরা ইতিপূর্বে এমন কোন কিতাব দিই নাই যাহা ইহারা পাঠ করিতে থাকিবে, আর না তোমার পূর্বে ইহাদের প্রতি কোন সাবধানকারীই পাঠাইয়াছিলাম।" (৩৪/৪৪)

(ঝ) 'ইহা খোদার বাণী, যাহা যথাযথভাবে আমি তোমাদিগকে শুনাইতেছি, কেননা আল্লাহ্ দুনিয়াবাসীদের উপর কোন জুলুম করার কোনই ইচ্ছা রাখেন না।" (৩/১০৮)

"হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী রহিয়াছে। তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখিতে পায়।....." (৯/১২৩) "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নাই।...." (২/২৫৬)

(ঞ) ".... এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল—তাহারা ঈমানদার লোকদের মধ্য হইতে হউক কিংবা পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে হউক। ..." (৫/৫) "হে ঈমানদার লোকগণ! ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না,......" (৫/৫১)

(ট) "হে নবী, মু'মিন লোকদিগকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কুড়িজন লোক যদি ধৈর্যশালী হয় তবে তাহারা দুইশতের উপর জয়ী হইবে। আর যদি একশত লোক এইরূপ থাকে তাহা হইলে সত্য অমান্যকারীদের এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে। কেননা উহারা এমন লোক, যাহারা জ্ঞান রাখে না।" (৮/৬৫)

"এইভাবে আল্লাহতা'আলা তোমাদের বোঝা হালকা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, এখনও তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি একশো লোক ধৈর্যশালী হয়, তবে তাহারা দুইশতের উপর, আর হাজার লোক এইরূপ হইলে দুই হাজার লোকের উপর আল্লাহ্‌র হুকুমে জয়ী হইবে।....." (৮/৬৬)

(ঠ) "আর হে নবী, শত্রু যদি শান্তি ও সন্ধির জন্য অগ্রহী হয় তবে তুমিও উহার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।....." (৮/৬১)

"অতএব তোমরা সাহসহীন হইয়া পড়িও না এবং সন্ধি-সমঝোতার আবেদন করিয়া বসিও না। আসলে তোমরাই বিজয়ী হইয়া থাকিবে। ...." (৪৭/৩৫)

১২। আল্লাহ্ কি কোন নির্দিষ্ট মানব-গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন, না করা সম্ভব?

আল্লাহ্ যদি সত্যিই সারা জাহানের মালিক হয়ে থাকেন তবে তাৎক্ষণিক উত্তর আসবে, 'নিশ্চয়ই পারেন না'। কিন্তু কুরআন শরীফ একবার পড়ার পর যে-কোন পাঠকের মনে হবে, ইসলামের আল্লাহ সমস্ত দুনিয়ার আল্লাহ্ বা মালিক নহেন—তিনি শুধু মুসলমানদের আল্লাহ্ এবং মালিক। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কুরআন থেকে অনেক আয়াত-ই উদ্ধৃত করা যায়; কিন্তু আমরা সেদিকে না যেয়ে মাত্র ২/৩টি আয়াত উদ্ধৃত করবো।

(ক) "এখন দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা (পড়ুন মুসলমান সম্প্রদায়) যাহাদিগকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে।" (৩/১১০)

(খ) "আর যে ব্যক্তি বস্তুতঃই আল্লাহ্, তাঁহার রসুল এবং ঈমানদার লোকদিগকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাইবে তাঁহার একথা জানা দরকার যে কেবলমাত্র খোদার দলই (পড়ুন মুসলমান সম্প্রদায়ই) জয়ী হইবে। " (৫/৫৬)

(গ) "........ জানিয়া রাখ, শয়তানের দলের লোকেরাই (পড়ুন কাফেররাই) ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" (৫৮/১৯)

আল্লাহ্ যে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তার প্রমাণ কুরআনের বহু আয়াতে লিপিবদ্ধ করা আছে। হজরত মুহাম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির (Attainment of Prophethood) পূর্বে আল্লাহ্ যে-সব পয়গম্বর পৃথিবীতে প্রেরণ বা নিযুক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে আদম (Adam), ইব্রাহীম (Abraham), ন্যুহ (Noah), মুসা (Moses), ঈসা (Jesus) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এঁদের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে আর্যাবর্ত নামক উপমহাদেশে যে-সব মহাপুরুষের, বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। কুরআনের মতে, আল্লাহ্ যদি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হয়ে থাকেন, তবে তো তাঁর পক্ষে এতাদৃশ ভ্রম বা বিস্মৃতি ঘটা উচিত ছিল না। সুতরাং ইসলামের আল্লাহ্ শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ আর-ও একটি কাজ করেছেন যা তাঁর পদমর্যাদার একান্তই পরিপন্থী। তিনি বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর ভিত্তিতে তাঁরই সৃষ্ট মানবসমাজকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং এই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর সংগাও তিনি অদ্ভুতভাবে নির্ধারণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদের অনুগামী একমাত্র তাদেরকেই তিনি বিশ্বাসী এবং ঈমানদার বলে আখ্যায়িত করেছেন, আর যারা তাঁদের অনুগামী নয় তাদের অবিশ্বাসী বলেছেন।

আমরা জানি এবং এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য-ও বটে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল কারণ হিসেবে অনাদি-অনন্ত কাল থেকে এক অভিন্ন সত্তা বিরাজ করছেন। এই এক এবং অভিন্ন সত্তাকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করে আসছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ গড (God), আবার কেউ বা আল্লাহ্। কিন্তু ইসলাম এই মতবাদের সাথে সহমত পোষণ করে না। তাদের মতে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কুরআনে যা লিপিবদ্ধ করেছেন একমাত্র তা-ই সত্য এবং অভ্রান্ত, আর সব পন্থ বা মতবাদ যাই থাকুক না কেন, তাদের সবই ঝুটা এবং না-পাক অর্থাৎ অপবিত্র। সুতরাং পরিত্যজ্য। শুধু তাই নয়, ইসলাম ভিন্ন যারা অন্য পন্থায় বিশ্বাসী তারা ইহজগতে নিকৃষ্টতম জীব এবং পরজগতে কঠিন শাস্তির যোগ্য।

ভাবতে অবাক লাগে এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করে ঃ যে-পন্থ বা সম্প্রদায়ের জন্ম বা অভ্যুত্থান মাত্র চোদ্দশত বৎসর পূর্বে, তার প্রবর্তক এবং তাঁর অনুগামীরা নিজেদের বলছেন বিশ্বাসী; পক্ষান্তরে, যারা কমবেশী ছয় সহস্র বৎসর ধরে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আসছেন তাদেরকে বলা হচ্ছে অবিশ্বাসী। 'বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী' নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানলাম।

১৩। বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর সংগা কী? নির্দিষ্ট কোন মানব-গোষ্ঠীর বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কি অন্য কোন মানব-গোষ্ঠীর আছে?

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী এই শব্দ দু'টির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। যেহেতু বর্তমানের আলোচনার বিষয়বস্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস নিয়ে, তাই আমাদের বক্তব্য এর ভেতরই সীমাবদ্ধ রাখবো, বাইরে যাবো না। তবে ইসলামের আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর সংগা নির্ধারণ করতে যেয়ে আলোচনাকারীকে নিঃসন্দেহে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ, কুরআনের মতে, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের বাণীতে বিশ্বাসী একমাত্র তারাই বিশ্বাসী, আর যারা তাতে বিশ্বাসী নয় তারাই অবিশ্বাসী। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনাটি ঠিক উল্টো। যে কোন ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠী বিশ্বনিয়ন্তা হিসেবে এক সর্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাসী, তিনি বা তারাই সাধারণভাবে বিশ্বাসী নামে পরিচিত, যে নামেই এই সত্তাকে সে বা তারা অভিহিত করুন না কেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, ইসলামের প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর সংগা সম্পূর্ণ আলাদা। কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ ".... যাহারা খোদার নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তাহারাই কাফের।" (৫/৪৪) এবং কাফের মানেই অবিশ্বাসী। সুতরাং কোন মুসলমানই কাফেরদের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক রাখবে না, বন্ধুত্বতো কখনোই নয়। খুব ভাল কথা। সে-ক্ষেত্রে কারুর সাথে কোন দ্বন্দ্বের প্রশ্ন নেই। যে-যার পন্থ বা বিশ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে, সাধারণভাবে এটাই তো কাম্য। কিন্তু না, ইসলামি অভিধানে, সহাবস্থানের কোন বিধান নেই, যদি না বাধ্য হয়। হয় ইসলাম থাকবে, নয় অন-ইসলাম থাকবে। মোট কথা, যদ্দিন না এর একটা ফয়সালা হচ্ছে, তদ্দিন এ-লড়াই চলতেই থাকবে, অবশ্যই ইসলামী মতে। উদ্দেশ্য? পৃথিবীতে ইসলামের 'সত্য দ্বীন' প্রতিষ্ঠা করা। সত্য দ্বীন বলতে ইসলামে বুঝায় আল্লাহ্‌তা'আলা ও তাঁর রসুলের নির্দেশনামা যা কুরআনে লিপিবদ্ধ করা আছে। জিহাদ উদযাপন তাদের অন্যতম এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ।

ইসলাম প্রধানতঃ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের নাম—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। এই পাঁচটি স্তম্ভের প্রথমটি অর্থাৎ 'কলেমা' বাদে বাকী যে চারটি স্তম্ভ আছে, তার সব ক'টিই কোন না কোন নামে মনুষ্য সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং এ চারটি স্তম্ভ নিয়ে ইসলামের কোন বিশেষত্ব নেই। তবে হ্যাঁ, 'কলেমা' নিয়ে অবশ্যই ইসলাম বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। কারণ, এই 'কলেমা'-ই ইসলামকে বিশ্বের আর সব পন্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

পক্ষান্তরে, বিশ্বনিয়ন্তাকে যারা ঈশ্বর বা অন্য কোন নামে অভিহিত করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন এবং পূঁজা করেন তাদেরকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল বলছেন 'অবিশ্বাসী'। বলছেন বটে,

কিন্তু তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরেন নি। সুতরাং আবার প্রশ্ন ঃ একথা কি তবে সর্বজন-স্বীকৃত নয় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এক অদৃশ্য সত্তা বা শক্তি যাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যিনি তাঁর কাজ প্রতিনিয়ত অতি সংগোপনে এবং নিষ্ঠার সাথে করে চলেছেন? যে নামেই তাঁকে ডাকা বা সম্বোধন করা হোক না কেন, নামের পরিবর্তনেই কি সে-সত্তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে? উত্তরে শুধু একটি কথাই বলা চলে ঃ বিশ্বনিয়ন্তা এক এবং অদ্বিতীয়, নামের পরিবর্তনে তাঁর গুণগত কোন পার্থক্য ঘটে না। সুতরাং যিনি একদিন ঈশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন (এবং আজ-ও আছেন), তিনিই পরবর্তীকালে গড (God) নামে পরিচিত হয়েছেন। আবার তারও কিছুদিন পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সেই একই সত্তা আল্লাহ্ নামে পরিচিত হয়ে আসছেন। সুতরাং আশা করবো, ইসলাম বা মুহাম্মদপন্থীরা বিশ্বজনমানসে কোনপ্রকার বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে সঠিক পথে এগিয়ে যাবেন। এতৎসত্ত্বেও ইসলামপন্থীরা যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করেন এবং জোরজুলুম করে ইসলামকে অন্য সব পন্থের উপর চাপিয়ে দেবার কার্য চালিয়ে যান তবে স্বীকার করতেই হবে, ইসলামের আল্লাহ্ বিরাট মানবগোষ্ঠীর আল্লাহ্ নন, শুধুমাত্র খোদার বান্দাহদের আল্লাহ্।

এবার আসা যাক, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের উপর আঘাত হানতে পারে কিনা, সে-প্রসঙ্গে। একদিন ছিল (এবং সে-দিনগুলি খুব বেশী পেছনের-ও নয়), যখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা মতের স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না; 'জোর যার মুলুক তার'—নীতি মেনেই বিশ্বের সব কিছু নির্ধারিত হতো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে, সেই বর্বর যুগের গাঢ়-অন্ধকারের বুক চিড়ে ক্রমান্বয়ে আলোর রেখা ফুটে উঠছে। বাক-স্বাধীনতা (Freedom of Speech) ও সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতার (Freedom of Association) মতো স্বাধীনভাবে কোন নীতি বা আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী বা আস্থাবান হওয়া আজ বিশ্বজনমানসে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টির বিশ্বাসের উপর অপর কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টির জোর জুলুম কিংবা কোনরূপ কটাক্ষ করা আজ শুধু নিন্দনীয়-ই নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। কিন্তু ইসলাম বা মুহাম্মদপন্থীরা এর ব্যতীক্রম। তারা তাদের শরিয়তী আইনের (অর্থাৎ হাদীস ও কুরআনে যা বলা আছে) বাইরে একচুলও যেতে প্রস্তুত নন। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে!

(ক) মুসলমানরা মনে করেন, একমাত্র তারাই বিশ্বাসী, আর সবাই অবিশ্বাসী। কারণ, তাদের মতে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস করে না তারাই অবিশ্বাসী এবং শাস্তির যোগ্য।

(খ) তারা বিশ্বাস করেন, আল্লাহ্ সমস্ত পৃথিবীটাকেই তাদের ভোগদখলের অধিকার দিয়েছেন। এখানে অন্যের কোন অধিকার নেই। সুতরাং জোর কদমে জিহাদ কর, নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা কর এবং পৃথিবী ভোগ কর। যদি জিহাদে মৃত্যু হয়, কোন ক্ষতি নেই, মুজাহিদদের (যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে তাদের মুজাহিদ বলে) জন্যে অনন্ত-জান্নাত অপেক্ষা করছে

তাদের স্বাগত জানাবার জন্যে।

(গ) 'রোজ কেয়ামতে' অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনে মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করে কীভাবে পুরস্কৃত হবেন এবং কাফেররাই-বা জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে কীভাবে শাস্তিভোগ করবে তার বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর আমরা কাফেরদের কিছু নিয়মকানুন ও বিশ্বাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাবো।

(ক) হিন্দুরা শেষ অবতার বা শেষ গ্রন্থে বিশ্বাসী নয়। তারা বিশ্বাস করেন, জীবকে সঠিক পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত অবতারদের আবির্ভাব ঘটে ধারাবাহিকভাবে। এই ধারাবাহিকতা কোনদিন বন্ধ হবে না—চলতেই থাকবে। সেই পথ ধরেই বর্তমান বিশ্বের সর্বশেষ অবতার হিসেবে বিরাজ করছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। যতদিন না নতুন কোন অবতারের আবির্ভাব ঘটবে ততদিন পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-যুগই চলবে।

(খ) খৃষ্টান বা ইসলাম পন্থীদের মতো হিন্দুরা বিশ্বাস করেন না যে ঃ একমাত্র তাদের মত ও পথই সত্য, আর সব মিথ্যা। তাই তারা জোর জুলুম করে নিজেদের মতবাদ এবং বিশ্বাস অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার শুধু বিরোধীই নয়, এরূপ কাজকে অত্যন্ত গর্হিত বলেও মনে করেন।

(গ) হিন্দুরা বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট নির্দিষ্ট কোন মানব-গোষ্ঠী পৃথিবীর সব কিছুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার অধিকারী। তাদের মতে, পৃথিবীতে যতপ্রকার মত ও পথের মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান তাদের সবার-ই স্বাধীনভাবে এবং বিনা বাধায় স্ব স্ব মতপ্রকাশ ও প্রচারের অধিকার আছে।

(ঘ) তারা সত্যিকারের বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিরাট মানব-সমাজকে একই পরিবারভুক্ত বলে তারা মনে করেন, আর্যঋষিরা যাকে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বলেছেন।

(ঙ) কোনপ্রকার বাছবিচার অর্থাৎ আপন-পর বিবেচনা না করে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যেই তারা মঙ্গলকামনা করেন। সবাই সুখে থাকুক, সবাই রোগমুক্ত থাকুন, বিশ্বনিয়ন্তার কাছে এই তাদের প্রার্থনা—'সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ'।

(চ) হিন্দুরা সমস্ত মানবসন্তানকে অমৃতের সন্তান ('অমৃতস্য পুত্রাঃ') বলে মনে করে। কারুর প্রতি কোনপ্রকার ঘৃণা বা দ্বেষ পোষণ করে না।

(ছ) সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তার কাছে তাদের প্রার্থনার মন্ত্র ঃ 'অসতো মা সদ্গময়ঃ, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যুর্মামৃতং গময়ো', অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু! অসত্য থেকে আমাদের সত্যের পথে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আলোর পথযাত্রী করো এবং মৃত্যু থেকে অমরত্বের পথ দেখাও'।

(জ) সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ হিসেবে তারা এক ঐশ্বরিক শক্তি বা সত্তায় বিশ্বাসী। তারা মনে করেন, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পরম এই সত্তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই সত্তা এক এবং অভিন্ন।

(ঝ) যেহেতু ভোগবাদ মানুষের মনকে সততঃই আশান্ত করে তোলে—ক্ষণিকের জন্যেও শান্তি দিতে পারে না, তাই তারা বস্তুবাদকে সযত্নে পরিহার করে অধ্যাত্মবাদে নিজেদের নিয়োজিত করেছে।

(ঞ) তাদের মানসিকতা নির্দিষ্ট কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের আশা ঃ পৃথিবীর যেখানে যতো সৎ-চিন্তা, সৎ-ভাবনা আছে তারা সব এসে তাদের মনকে সমৃদ্ধ করুক—'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ'।

(ট) তাদের প্রার্থনার মন্ত্র ঃ "ভূর ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।" অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ভেতর প্রাণের সঞ্চার করেছ, দুঃখ-দুর্দশা দূর করার মালিক, শান্তিদাতা, বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা, তুমি তোমার পাপনাশকারী আলোর দ্বারা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে সমৃদ্ধ কর এবং সঠিক পথে পরিচালনা কর।

(ঠ) 'শেষ বিচারের দিন' বলে কোন কিছুতে হিন্দু-চিন্তন বিশ্বাস করে না। জীবনের ধারাবাহিকতায় তারা বিশ্বাসী। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তারা তাদের সু এবং কু-কর্মের ফল ভোগ করতে থাকেন। অবশেষে যখন তাদের কু-কর্মের ভোগ শেষ হয় তখন তাদের আত্মা পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মে যেয়ে মিলিত হয় এবং চিরশান্তি লাভ করে।

অতি সংক্ষেপে হিন্দু ও মুসলীম-চিন্তন পাশাপাশি তুলে ধরা হলো। এবার পাঠকের পালা। তারাই সিদ্ধান্তে আসুন, কারা সীমালংঘনকারী এবং কারা-ই-বা মানবতার শত্রু বা মিত্র।

যদিও এই অধ্যায়ের সূচনায় বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের সংগা এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে এবং এই পুস্তকের অন্যত্র পৌত্তলিকতা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে তবু-ও এ-দু'টি বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে আমরা আরো কিছু কথা পাঠকের সামনে উপস্থিত করবো। খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ আরব দেশের মক্কা নামক নগরীতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হজরত মুহাম্মদের জন্মের হাজার হাজার বছর পূর্বে আর্যাবর্তের (বর্তমান ভারতবর্ষের) আর্য-ঋষিরা সর্বশক্তিমান এক সত্তায় বিশ্বাস করতেন, যাঁকে তাঁরা ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজমান (Omnipotent, Omniscient and Omnipresent)! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণও তিনিই। তাঁর ইচ্ছা বা অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত ব্যতীত বিশ্বচরাচরে কোন কিছু সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা বুঝেছিলেন, এই অভিন্ন এক সত্তা বা সত্যকেই বিভিন্ন মানুষ বা মানব-গোষ্ঠী বিভিন্ন নামে সম্বোধন করে এবং তাঁর প্রতি প্রণতি জানায়। বৈদিক ঋষিদের ভাষায় ঃ 'একং সৎবিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। সুতরাং হজরত মুহাম্মদ কর্তৃক আল্লাহ্‌র আবিস্কার এবং একমাত্র তাঁর অনুগামীরাই বিশ্বাসী, আর সবাই অবিশ্বাসী—একথার কোন অর্থ হয় না কিংবা কোন যুক্তি তর্ক দিয়েও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তদুপরি আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায় ঃ কে বা কারা বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, তা নির্ধারণ করার অধিকার হজরত মুহাম্মদ পেলেন কোথা থেকে? যদি বলা হয় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে, সেক্ষেত্রে অপরপক্ষ বলবে,

তিনি তো পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তাঁরও সে অধিকার নেই। বড় জোর, তিনি তাঁর অনুগামীদের বলতে বা আদেশ দিতে পারেন এই মর্মে যে, 'আমি এবং আমার আল্লাহ্ যা বলছি বা বলছেন তা ভালভাবে অনুধাবন কর এবং সেমতে জীবন-যাপন কর। তার বাইরে যেও না।' সমগ্র মানবজাতির দিকে আঙ্গুলি উচিয়ে কোন নির্দেশ দেয়ার তিনি কেউ নন।

আর পৌত্তলিকতা? তা কোনভাবেই অপরাধ কিংবা ঈশ্বর বিরোধী কাজ বলে গণ্য হতে পারে না; বরং সমস্ত কৃষ্টি ও সভ্যতার মূলে রয়েছে এই প্রথার প্রচলন। প্রাসঙ্গিক বিধায় সম্প্রতি দিল্লীর একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা ORGANISER-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছিঃ "Idol worship was an inseparable part of ancient civilization of the world. it did not matter if the civilization belonged to Greece, India or Mesopotomia... wherever there is an archaeological excavation the old civilizations throw up ancient statues... In Arabia, where there is no idol worship today, before the advent of Islam, it was very common there. Every clan had its own god. It is interesting to note that there are some similarities among different civilizations evolved at various places. For example, they all visualised a god or goddess for knowledge, wealth, beauty, rain etc. At places the shape and appearance of the idols is uncannily similar, the majority of statues discovered in the world are Ganapati (the god of success and wealth)..... Lord Ganapati is the god of gods". যারা দেব-দেবীর পূজা করেন, তারা বিশ্বাস করেন যে, এই দেব-দেবীরাই তাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। এই বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারুর নেই, যেমন নেই ইসলামের অনুগামীদের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করার, যারা বিশ্বাস করেন 'রোজ কেয়ামতে' (শেষ বিচারের দিনে) আল্লাহ্ বিবিধ ভোগ্যসামগ্রী সহ প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের জান্নাতী-জীবনে দু'টি করে (সুরম্য অট্টালিকা-সহ) উদ্যানবাড়ী দেবেন, চিরকাল রাজার হালে বসবাস করার জন্যে। তাদের এ-বিশ্বাসে প্রশ্ন তোলার অধিকার যদি কোন অ-মুসলমানের না থেকে থাকে তবে কোন মুসলমানেরও হিন্দুদের দেব-দেবী পূজার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার উচ্চ-বাচ্য করার অধিকার নেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন উঠবেঃ মুসলমানরা কোন্ যুক্তিবলে এবং অধিকারে হিন্দু-নিধনে এবং তাদের দেব-দেবীর ধ্বংস-সাধনে জিহাদ ঘোষণা করেন? যারা মূর্তি-পূজায় বিশ্বাসী নয়, তারা সে-কাজ থেকে শতহস্ত দূরে থাকুন, তবেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু সেপথে না গিয়ে তারা যদি অপরের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করে এবং হিংসার আশ্রয় নেয়, তবে তাদের সে-সব কাজকে অত্যন্ত শুদ্ধ ভাষায় 'বর্বরোচিত আচরণ এবং গুণ্ডামী'

ভিন্ন অন্য কোন আখ্যায় ভূষিত করা যায় না।

১৪। একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতা ও অংশীদারবাদ

মানবসভ্যতার উষালগ্নে যখন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আর্যাবর্তের (পরবর্তীকালে অখণ্ড ভারতবর্ষের) আর্য ঋষিরা প্রকৃতির নানাপ্রকার রুদ্রমূর্তি ও ভীতিজনক ঘটনাকে (Horrifying Phenomena) যেমন ঝড়-ঝঞ্ঝা, তুফান, প্লাবন, বিদ্যুৎ-চমকান, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাদের প্রত্যেককে ভগবান-জ্ঞানে পূজা করতো এবং তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে নানাবিধ প্রার্থনা স্তোত্র এবং গাঁথা রচনা করেছিলেন। প্রথমাবস্থায় এসব গাঁথা মুখে মুখেই পুরুষানুক্রমে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে সঞ্চারিত হতো। পরবর্তীকালে কোন-ও এক সময় মহর্ষি বেদব্যাসের চেষ্টায় এই গাঁথা বা মন্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ হয় এবং তা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠতম ভাষা সংস্কৃতে।

একেশ্বরবাদ ঃ সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে নৈসর্গিক এবং আধিভৌমিক কিছু ঘটনাকে অতি ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা বা শক্তির কাজ বলে স্বীকার করে নিলেও কালক্রমে সেই ঋষিদের মধ্যে অনেকে বুঝতে পারলেন, প্রাকৃতির এই যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং তার অভিব্যক্তি (কখনো ভয়ঙ্করী, আবার কখনো বা মনোহারিণী) সে-সবের নিয়ামক বা কর্তা ভিন্ন ভিন্ন সত্তা নয়—এ সব কিছুর পেছনেই আছে অভিন্ন এক সত্তা বা সত্য যাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন। আর্যঋষিরা এই সত্তাকে যে-ভাবে অনুভব করেছেন তার কিছু উদাহরণ নিম্নে দেয়া গেলো।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিম্ আহুর্
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ"।। ঋঃ ১/১৬৪/৪৬

"They speak of Indra, Mitra, Varuna, Agni, and there is Divine winged Suparna.
The One Being the wise call by many names as Agri, Yama, Matariswan." (R. I/164/46; Also A.)

অপর এক ঋষিবরের অনুভূতিতে ধরা পড়লো ঃ

"বেদাহং এতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাত্।
তম্ এব বিদিত্যাতি মৃত্যুম্ এতি
নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।।" য. (বা). ৩১/১৮

"I have known this Mighty Being refulgent as the sun beyond

darkness;
By knowing Him alone one transcends death, there is no other way to go." (Y. 31. 18)

আর একজন সত্যদ্রষ্টা বল্লেন ঃ

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীত্।
স দধার পৃথিবীং দ্যাম্ উতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।।" ঋ. ১০/১২১/১
"Who is the Deity we shall adore with our oblation?
The Divine Being who existed in the beginning,
Who was manifest as the One Lord of creation,
And who upheld this earth and this sky." R. X. 121. 1
"য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হাবিষা বিধেম।" ঋ. ১০/১২১/২
Who is the Deity we shall adore with our oblation?
He who bestows soul-force and vigour,
Whose law the whole world obeys, the cosmic powers obey,
Whose shadow is immortality and death." R. X. 121.2

[উপরে উদ্ধৃত মন্ত্র দু'টিতে অভিন্ন একটি প্রশ্ন আছে ঃ আমরা আমাদের অর্ঘ্য দিয়ে কোন্ দেবতার পূজা করবো? সাথে সাথে উত্তর-ও প্রশ্নকর্তা-ই দিয়েছেন। বেদ সংহিতার যে সব মন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ উপরে উদ্ধৃত হলো তার সব ক'টিই শ্রী অবিনাশ চন্দ্র বসুর "The Call of the Vedas" থেকে সংগৃীত।]

এই হলো ঈশ্বর বা ভগবান সম্বন্ধে আর্যঋষিদের জ্ঞান, ভাবনা বা অনুভূতি—যা-ই বলুন না কেন। এই অনুভূতি বা Realisation কিন্তু সবার মনে সমানভাবে অনুভূত বা সঞ্চারিত হয়নি। ফলে, অখণ্ড ঈশ্বর-ভাবনার পাশাপাশি খণ্ডিত ঈশ্বর-ভাবনাও চলতে থাকলো, যে-ভাবনার আজো নিষ্পত্তি হয়নি অথবা কোন দিন হবে কিনা তাও জানা নেই।

পৌত্তলিকতা ঃ এই খণ্ডিত ভাবনার সাথে পৌত্তলিকতার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। প্রকৃতি-উপাসনার যুগে যেমন অগ্নি, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, সুপর্ণ প্রভৃতির কোনরূপ রূপ বা প্রতিকৃতি উপাসকদের মানসপটে প্রতিভাত হয়নি, পৌত্তলিকতার যুগে এসে তার ঘটলো ব্যতীক্রম। সভ্যতার এই স্তরে এসে মানুষের কল্পনায় ধরা দিলো তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নানাধরণের রূপ বা আকৃতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে ঃ মানুষের মনস্কামনা পূরণের দেবতা হিসেবে সিদ্ধিদাতা গণপতিকে তারা বেছে নিলেন তাদের উপাস্য দেবতা হিসেবে, ধনসম্পদ ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে যথাক্রমে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে, আবার সকল শিল্পকর্মের দেবতা হিসেবে কেউ বেছে নিলেন বিশ্বকর্মাকে, সৃষ্টির প্রতীক হিসেবে শিবলিঙ্গের সাথে

গৌরীপট্টকে। যারা পৌত্তলিকতাকে কুসংস্কার বা ঈশ্বরের সাথে অংশীদারিত্ব করা হচ্ছে বলে গালমন্দ দেন এবং কুৎসা রটনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তারা পৌত্তলিকতার অর্থই জানেন না, বা বুঝেন না, অথবা না-জানার বা না-বুঝার ভান করেন এবং সেই সুযোগে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করেন। একটু পরেই আমরা এই অংশীদারতত্ত্বের কথায় যাবো। তার পূর্বে 'সীরাতুন নবী' শির্ষক গ্রন্থ থেকে কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। গ্রন্থকার লিখছেন ঃ ''ইসলামপূর্ব আরব দেশে বিভিন্ন ধর্মের প্রচলন ছিল। কিছু লোকের ধারণা ছিল যে, যা কিছু হয় তৎসমুদয়ই কালের আবর্তনে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মে হয়; আল্লাহ্ বলতে কোন কিছু নেই। এ প্রকৃতিপূজারী লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে ঃ 'তারা বলে, যা কিছু হয় সবই হল আমাদের দুনিয়ার এ জীবন। আমরা মৃত্যুবরণ করি, জীবনধারণ করি। আমাদিগকে মারলে এ মহাকালই মারে।' (সুরা জাসিয়া, রুকু ৩)। 'কিছু লোক আল্লাহ্-র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তারা কেয়ামত, পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি অস্বীকার করতো। তাদের এরূপ বিশ্বাসের মোকাবেলায় কেয়ামত প্রমাণ করতে কোরআন এরূপ যুক্তি পেশ করেছে— '(হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, পুরাতন অস্থিসমূহকে তিনিই পুনঃ সৃষ্টি করবেন, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।' (সুরা ইয়াসীন, রুকু ৫)। ''কিছু লোক আল্লাহ্ এবং পরকালের পুরস্কার এবং শাস্তিতে বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা নবুওত অস্বীকার করত। নিম্নের আয়াতে তাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ 'তারা বলে যে এ আবার কেমন রসুল, যিনি পানাহারও করেন এবং বাজারেও চলাফেরা করেন।' 'তারা বলে যে, আল্লাহ্ কি মানুষকেই শেষ পর্যন্ত নবীরূপে প্রেরণ করলেন?' ''তাদের ধারণা ছিল যে অগত্যা কেউ নবী হলে তিনি মানুষ না হয়ে বরং ফেরেশতা হতে পারেন, যিনি মানবীয় প্রয়োজনমুক্ত থাকবেন। সাধারণত এসব লোক প্রতিমাপূজক ছিল। তারা প্রতিমাকে আল্লাহ্ মনে করত না, বরং আল্লাহ্র সান্নিধ্যলাভের মাধ্যম মনে করত।'' (তারা বলে) 'আমরা এ সমস্ত দেব-দেবীর উপাসনা এ জন্যই করি যে তারা আমাদিগকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে'। (সুরা যুমার, রুকু ১)।'' ('সীরাতুন নবী'-পৃষ্ঠা ১২)।

পৌত্তলিকতা সম্পর্কে 'সীরাতুন নবী' থেকে পুরো অনুচ্ছেদটি তুলে দিলাম, যাতে পাঠক আমাদের বক্তব্যের সাথে তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করে নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। এই পৌত্তলিকতা নিয়ে মুহাম্মদ-পন্থীদের নিকট আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্ন আছে। বিশিষ্ট ফকির-দরবেশদের মাজারে (কবরে) ধুপ-বাতি জ্বালানো, মক্কার কাবা মসজিদের গায়ে 'হাজর-এ-আসওয়াদ' নামক যে পবিত্র প্রস্তর খণ্ডটি আছে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কিংবা খোদ খোদার প্রতিনিধি হজরত মুহাম্মদের পবিত্র কেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন (যাঁর এক গুচ্ছ কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে রক্ষিত আছে) কি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, পৌত্তলিকতার সংগার মধ্যে পড়ে না? যদি না পড়ে, তবে ইসলাম বা মুহাম্মদ-পন্থীদের মধ্যে বর্তমানে যাঁরা পণ্ডিত বলে পরিচিত এবং খ্যাত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে এর যথাযথ

কারণ এবং ব্যাখ্যা জানার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রইলাম।

অংশীদারবাদ ঃ মুসলমানদের মতে, হিন্দু কাফেররা পূজা আরাধনার-মাধ্যম তাদের দেব-দেবীকে আল্লাহ্‌র অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ঠিক এর বিপরীত। কুরআনের আয়াতসমূহকে যদি প্রমাণ্য বলে ধরে নেয়া যায় তবে দেখা যাবে, স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই হজরত মুহাম্মদকে নিজের অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন আয়াতে আল্লাহ্ নিজের উপরে-ও তাঁর রসুলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন বা মেনে নিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

(ক) "হে নবী! লোকদের বলিয়া দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই খোদার প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমার অনুসরণ কর; তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুণাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (৩/৩১)

(খ) "তাহাদের বল, আল্লাহ্ এবং রসুলের আনুগত্য কবুল কর।...." (৩/৩২)

(গ) "এবং আল্লাহ্ ও রসুলের হুকুম মানিয়া লও; আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হইবে।" (৩/১৩২)

(ঘ) "হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের আনুগত্য কর, এবং আদেশ শুনিবার পর তাহা অমান্য করিও না।' (৮/২০)

(ঙ) "যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকদের বিরুদ্ধে, যাহারা.. আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে হারাম করে না, এবং সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না।...." (৯/২৯)

(চ) "তাহারা কি জানে না যে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের সহিত মুকাবিলা করে তাহার জন্য দোযকের আগুন রহিয়াছে, যাহাতে তাহারা চিরকাল থাকিবে?..." (৯/৬৩)

(ছ) "আর তোমাদের মধ্যে যে খোদা ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য করিবে এবং নেক আমল করিবে তাহাকে আমরা দ্বিগুণ ফল দান করিব এবং আমরা তাহার জন্য সম্মানজনক রেযক নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি।" (৩৩/৩১)

(জ) "কোন মু'মেন পুরুষ ও কোন মু'মেনা স্ত্রীলোকের এই অধিকার নাই যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন, তখন সে নিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোন ফয়সালা করিবার ইখতিয়ার রাখিবে। আর যে লোক খোদা ও তাঁহার রসুলের নাফরমানী করিবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হইল।" (৩৩/৩৬)

(ঝ) "যে ব্যক্তি রসুলকে মানিয়া চলিল সে মূলতঃ খোদারই আনুগত্য করিল;....." (৪/৮০)

(ঞ) "হে ঈমানদারগণ, ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁহার রসুলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যাহা আল্লাহ্ তাঁহার রসুলের প্রতি নাযিল করিয়াছেন। সেই কিতাবের প্রতিও ঈমান আন, যাহা আল্লাহ্‌তা'আলা ইহার পূর্বে নাযিল করিয়াছেন।...." (৪/১৩৬)

উপরে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ কোন কাজই একা করছেন না বা কোন

সিদ্ধান্তই একা নিচ্ছেন না—সব সময় তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদকে হয় সাথে রাখছেন, নতুবা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার বা নির্দেশ দেবার অধিকার দিচ্ছেন। এ থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্তে আসে যে, হজরত মুহাম্মদ এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদার হিসেবেই কাজ করছেন, তবে কি তিনি ভুল করবেন? অতঃপর আল্লাহতা'আলা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে একটি আয়াতে হজরত মুহাম্মদকে নিজের চেয়েও উচ্চাসনে স্থাপন করেছেন। আয়াতটি এরূপঃ

"আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরুদ পাঠান। হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরাও তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাও।" (৩৩/৫৬)

এই আয়াতটির প্রেক্ষাপটেই কি নিম্নোদ্ধৃত আপ্তবাক্যটি মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? বাক্যটি এরূপ ঃ

"BA KHUDA DIWANA BASHAD BA MUHAMMAD HOSHIYAR." [One can be negligent towards God but one must be circumspect (respectful) towards Muhammad. (Courtesy : Islam, The Arab Inperialism by Sri Anwar Shaikh). p. 72]

১৫। ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিরাট এক ধাপ্পা, মুসলমানরা নিজেরাই কি নিজেদের ভাই ও বন্ধু?

ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে 'সীরাতুন নবী'র রচয়িতা লিখছেন, 'ইসলামের সব চাইতে বড় অবদান বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা। মানুষে মানুষে সমতা সম-অধিকার কায়েম করা।" (পৃষ্ঠা ৩২০)। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের কোন আয়াতের (যা একমাত্র প্রামাণ্য) উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে, আমাদের হাতের কাছে কুরআন শরীফের যে কয়েকটি আয়াত আছে (অসংখ্য আয়াতের মধ্যে) তাতে এ-বক্তব্য শুধু অ-সমর্থনই করা হয়নি, পরন্তু বিরোধীতাই করা হয়েছে। আয়াত ক'টি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

(ক) "হে ঈমানদারগণ, নিজ জামা'আতের লোকেদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানাইও না।..... তাহাদের মনের প্রতিহিংসা তাহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া পড়িতেছে এবং তাহারা যাহা কিছু বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা এতদপেক্ষাও তীব্রতর। আমরা তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ও পরিস্কার হেদায়াত দান করিয়াছি, যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও (তবে তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করিবে)।" (সুরা ৩/আয়াত ১১৮)

(খ) "হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্র হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলিয়া দিতে চাও?" (৪/১৪৪)

(গ) "হে ঈমানদার লোকগণ! ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও

না, ইহারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তাহাদের মধ্যেই গণ্য হইবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ যালেমদিগকে নিজের হেদায়াত হইতে বঞ্চিত করেন।" (৫/৫১)

এর পরও যদি মুহাম্মদপন্থীরা বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করতে বলেন যে তারা আদম ও ইভের (Adam and Eve) সন্তানদের মধ্যে কোনপ্রকার পার্থক্য করেন না এবং তারা সবাই এক পরিবারভুক্ত ও বন্ধু, তবে সেই বক্তব্যকে বিরাট এক ধাপ্পা ভিন্ন আর কী বলা যেতে পারে?

মুসলমানরা যে কী পরিমাণে বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী তার নমুনা আমরা পেলাম। এবার দেখা যাক, নিজেদের মধ্যেই তারা কী পরিমাণ বন্ধুভাবাপন্ন এবং ভাই ভাই। হজরত মুহাম্মদ, শেষ জীবনে এসে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন, ইসলামী দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ ও গণীমতের পথে পরস্বাপহরণের যে রাজপথ তিনি তাঁর অনুগামীদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন (অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশে), তাঁর এন্তেকালের (মৃত্যুর) পর সে-পথ তো বন্ধ হবেই না বরং তা অন্তর্কলহ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হবে। তাই মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর অনুগামীদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "সাবধান! আমার পরে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে পথভ্রষ্ট হয়ো না। মনে রেখো, একদিন তোমাদের প্রভুর সমীপে হাযির হতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।" (সীরাতুন নবী, পৃঃ ৫০১)। হজরত মুহাম্মদ তাঁর শেষ ভাষণেও একই কথা একটু ভিন্নভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, "দেখ! আমাকে দুনিয়ার সকল ভান্ডারের চাবিকাঠি দান করা হয়েছে। আমি ভয় করি না যে আমার পর তোমরা পুনরায় শেরেকী করতে শুরু করবে, তবে ভয় হয় যে পার্থিব সম্পদের মোহে লিপ্ত হয়ে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি শুরু করে না দাও। এমনটা করলে পূর্ববর্তী উম্মতগুলো যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে, তোমরাও তেমনি ধ্বংস হয়ে যাবে।" (ঐ পৃষ্ঠা ৫০৭)।

হজরত মুহাম্মদের এই অনুমান বা আশংকা, যাই বলুন না কেন, অমূলক ছিল না। মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভীষণ লড়াই এবং কাজিয়া শুরু হয়ে গেলো। প্রথম খালিফা কে হবেন তা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছল। একদিকে মুহাম্মদের জামাতা হজরত আলী দাবী করছেন, তিনিই প্রথম খালিফা হবার যোগ্য ব্যক্তি; অন্যরা সে-দাবী অস্বীকার করে হজরত মুহাম্মদের প্রধান সহচর ও বিশ্বস্ত বন্ধু হজরত আবু বকরই এই পদের যোগ্য ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করলেন। অতঃপর যখন দেখা গেলো, এ-সমস্যার কোনই সমাধান হচ্ছে না তখন হজরত মুহাম্মদের প্রধান প্রধান অনুগামীদের এক সভায় সাব্যস্ত হলো ঃ প্রথম খলিফা হবেন হজরত-ই-আবুবকর, হজরত-ই-ওমর হবেন দ্বিতীয় খলিফা, হজরত-ই-ওসমান হবেন তৃতীয় খলিফা এবং হজরত আলী হবেন চতুর্থ খলিফা। কিন্তু এ-ব্যবস্থা হজরত আলী এবং তাঁর অনুগামীরা মানতে

রাজি হলেন না—হজরত আলীকেই প্রথম খলিফা বলে ঘোষণা করলেন। যারা এ-মতে মত দিলেন তারাই সীয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত হলেন। অপর পক্ষে যারা হজরত আবু বকরকে প্রথম খলিফা বলে স্বীকৃতি দিলেন তারা সুন্নী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। খিলাফৎ নিয়ে যে-বিভাজন মুসলমানদের মধ্যে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল অদ্যাবধি তা অব্যাহত আছে এবং দেশে দেশে এদের মধ্যে প্রতিনিয়ত দাঙ্গা ও মারপিট লেগেই আছে। কারণ সেই একটিই— দুনিয়ার যাবতীয় মালপানি এবং গণীমতের অধিকার কাদের অধিকারে থাকবে। এদের মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি কাদের আনুগত্য বেশি, তা নিয়ে কোন কথা বলবো না; কারণ তা আমার এক্তিয়ার-বহির্ভূত। কিন্তু যা এক্তিয়ারের মধ্যে তা হলো, দুনিয়ার জীবনে মাল-পানির অধিকার কার হাতে বা কর্তৃত্বে থাকবে, প্রধানতঃ তা নিয়েই এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। এ-দ্বন্দ্ব কোনদিন শেষ হবে বলে মনে হয় না। কারণ, ইসলাম বা মুহাম্মদপন্থীরা (সীয়া ও সুন্নী উভয়ই) ভোগবাদে বিশ্বাসী। যারা ভোগবাদে বিশ্বাসী তারা ভোগ্যপণ্যের অধিকার কোনদিনই বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দেয় না বা দেবে না। এই সীয়া-সুন্নী কলহ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী মুজাফ্ফর হোসেন যে বক্তব্য রেখেছেন, প্রাসঙ্গিক বিধায়, তা এখানে তুলে দিলাম। তিনি বলছেন ঃ "এই সীয়া-সুন্নী ঝগড়া কোন স্থানীয় ঘটনা নয়, এ ঝগড়া পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীর ৫২টি মুসলীম দেশের মধ্যে একমাত্র ইরানই 'সীয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত' মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত বা শাসিত। তার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য মুসলীম দেশে সীয়া সম্প্রদায়ের লোক নেই বা সীয়া-সুন্নীর মধ্যে কোন ঝগড়া নেই। ইরাকের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ সীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আফগানিস্তানে এদের সংখ্যা ১৪ শতাংশ। সংখ্যায় যতই কম হোক সীয়া সম্প্রদায়ভুক্তদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতই বেশী যে এদের বাদ দিয়ে কোন ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষেই শাসন-ব্যবস্থা চালানো সম্ভব নয়। তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাকের সাথে কুর্দদের স্বাধীনতার জন্য যে জীবন-মরণ সংগ্রাম চলছে আসলে তা সীয়া মতবাদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। বাহারাইনের বিরাট এক অংশ সীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সে-কারণেই সুন্নী সৌদি আরবের বুকে বিরাট এক কাটার মত তারা বিধে আছে।" (সৌজন্যে ঃ সাপ্তাহিক 'অর্গেনাইজার', ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৭)।

সীয়া-সুন্নী বাদেও মুসলমানরা আরও নানাভাবে বিভক্ত। এদের মধ্যে আহমদিয়াদের নাম উল্লেখযোগ্য—এরা আবার কাদিয়ানী বলেও পরিচিত। এতদ্‌ভিন্ন অতি সাম্প্রতিক কালের দু'টি ঘটনা উল্লেখের দাবী রাখে। তার একটি হলো—ইরাক-ইরানের দীর্ঘ আট বৎসরব্যাপী যুদ্ধ; অপরটি হলো, ইরাকের রাতারাতি কুয়েতকে নিজের দখলে নেয়া। এর ফলে সৌদি আরবকে (অবশ্যই আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায়) ইরাকের সাথে বিরাট এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। উল্লিখিত ইরান-ইরাক-যুদ্ধ এবং সৌদিআরব-ইরাক-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কার স্বার্থে কিংবা কোন্ উচ্চ-আদর্শ রক্ষার জন্যে? এই কি 'মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ভাই ভাই'-এর প্রমাণ? তদুপরি দীর্ঘদিন ধরে আলজিরিয়া, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে যা

চলছে তাকে গৃহযুদ্ধ ভিন্ন আর কোন্ আখ্যায় ভূষিত করা যায়? অখণ্ড ভারতের যে-সব মুসলমান পাকিস্তান-আদারের জন্যে জীবন-পণ লড়াই করেছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশে (বিশেষ করে করাচীতে) যেয়ে বসবাস করতে লাগলো তখন থেকে তাদের প্রতি স্থানীয় মুসলমানরা যে অমানুষিক আচরণ করে চলেছে, তাতে তারা তাদের জাতভায়ের প্রতি কীরূপ ভ্রাতৃত্বের পরিচয় দিচ্ছেন?

এই প্রসঙ্গে মোগল রাজত্বের ইতিহাসের পাতা থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। যেই মানুষটিকে কেন্দ্র করে সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তার নাম আলমগীর ঔরংজেব। ভারত-সম্রাট বৃদ্ধ শাজাহানের মৃত্যুর পূর্বেই কিংবা তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো যাতে নিয়মমাফিক উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দুস্থানের পরবর্তী সম্রাট না হতে পারেন তার জন্যে এক ঘৃণ্য এবং জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ঔরংজেব (তখনো তিনি 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করেননি)। কীভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাশিকো এবং অপর দুই ভাই সুজা ও মুরাদকে ষড়যন্ত্র করে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়েছিলেন এবং বৃদ্ধ পিতা শাজাহানকে আগ্রার দূর্গে বন্দী করে (সেখানে তিনি আমৃত্যু বন্দী ছিলেন) ঔরংজেব দিল্লীর তখত-এ-তাউসে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজে 'আলমগীর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন সে-সব ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, আলমগীর ঔরংজেব আর একবার প্রমাণ করলেন, মুসলমানরা বিশ্বভ্রাতৃত্ব দূরের কথা, নিজেদের মধ্যে তো বন্ধুভাবাপন্ন নয়-ই, এমন কি আপন ভ্রাতা ও নিজ পিতার প্রতি পাশবিক আচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না, যেখানে মালপানির হাতছানি আছে।

বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা খুব বড় গলায় ইসলামী উম্মা বা উম্মতের কথা বলে থাকেন, যার সরল অর্থ ইসলামি জাতীয়তাবাদ। এপ্রসঙ্গে শ্রী আনোয়ার শেখের কিছু বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন ঃ "People of other nations, when they embrace Islam, come to be united under the Arabian hegemony, and call themselves Umma or one nation. What a self-deception it is! It is a self-deception because Muslims of other countries are treated as foreigners in Arabia. They are not considered as citizens of Hijaz (Arabia); neither they are allowed to buy property there, nor permitted to run business independently. These Muslims are complete foreigners in Arabia, subject to Visa, Passport and all other laws governing the behaviour and obligations of the aliens. If Islam was really based on true brotherhood of all Muslims, irrespective of geographical boundaries, Mecca and Medina would have been international cities (at least to all the Muslims);...... This point

becomes clear when we realise that Muhammad laid the foundation of an Arab Empire in the name of Islam and not an Islamic Empire. The foreign Muslims did not have top-level representation in the government of Arabia during the times of Muhammad himself. Neither did they enjoy any such privilege during the heyday of the Arab political ascendency, nor is there any legal precedent to prove that a Muslim from any territory can become the President or Prime Minister of an Arab country. On the contrary, a person of any race and colour could become the head of the mighty Roman Empire, Yet the Muslims claim the superiority of the Islamic System." (Ibid-pp. 132-133)

আরব ভূখণ্ডে যে অনারব মুসলমানরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন না তার সাম্প্রতিকতম (১৯৯৯-২০০০ খৃঃ অঃ) উদাহরণ হলো, সে-দেশ থেকে হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমানকে বহিস্কার করে নিজ-দেশ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আশা করি, ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের, এর চেয়ে অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হবে না।

ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্বের ন্যায় বাজারে আর-ও একটি কথা চালু আছে। সেটি হলো ঃ ইসলাম শান্তিরও প্রতীক। উত্তরে বলা চলে—ইসলামের জন্ম থেকে অদ্যাবধি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি কথা-ই বেরিয়ে আসে ঃ নিঃসন্দেহে ইসলাম শান্তির প্রতীক, তবে সে-শান্তি শ্মশানের, জীবনের নয়!

১৬। ইসলামে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিহিংসাপরায়নতা এতো প্রকট কেন?

উদ্দেশ্য তিনটি। প্রধান উদ্দেশ্য কাফেরদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা, যাতে তারা কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করে; দ্বিতীয়, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা; আর তৃতীয়, কাফেররা যে নিকৃষ্টতম জীব তা প্রমাণ করা। এতেও যদি কাজ না হয় তবে কুরআনের ব্রহ্মাস্ত্র 'জিহাদ' তো আছেই। অর্থাৎ কুরআনের নির্দেশানুযায়ী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ (যুদ্ধ) ঘোষণা করে তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামপন্থে সামিল করা। কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ

(ক) "এমন কখনই হয় নাই যে, আমরা কোন লোকালয়ে নবী পাঠাইয়াছি, অথচ সেই লোকালয়ের লোকদিগকে প্রথমে অভাব ও কষ্টে নিমজ্জিত করি নাই—এই আশায় যে, তাহারা হয়ত নম্র ও কাতর হইয়া আসিবে।" (৭/৯৪)

(খ) "নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলার নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হইতেছে সেই সব লোক যাহারা মহাসত্যকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে;

পরে তাহারা কোনপ্রকারেই তাহা কবুল করিতে প্রস্তুত হয় নাই;......" (৮/৫৫)
(গ) "কোন নবীর জন্য ইহা শোভা পায় না যে, তাঁহার নিকট বন্দীলোক থাকিবে, যতক্ষণ সে যমীনে শত্রুবাহিনীকে খুব ভাল করিয়া মথিত না করিবে।......." (৮/৬৭) "সীরাতুন নবীর" গ্রন্থকার একই আয়াত অন্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। "কোন নবীর জন্য উচিত নয় যে ভালভাবে রক্তপাত ছাড়া মানুষকে বন্দী করবে।" (পৃষ্ঠা ১৮৬)

আমাদের সংযোজন ঃ দু'টি উদ্ধৃতির মমার্থ একই, অর্থাৎ কাফেরদের ভালভাবে রক্তপাত না ঘটিয়ে তাদেরকে বন্দী করা কোন নবীর পক্ষে শোভা পায় না। প্রথমে শত্রুপক্ষকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত কর, তাতে যতো রক্তপাতই হউক না কেন। রক্তপাতের পূর্বে বন্দী করা নবীজনোচিত কাজ নয়। অতঃপর বাদবাকী যারা জীবিত থাকবে তাদেরকে বন্দী করে দাস-দাসীতে পরিণত কর এবং 'মালে গণীমতের' নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌র রসুল ও মুজাহিদদের মধ্যে বাট করে নাও। অর্থাৎ 'কাট-লোট-বাট' এই ত্রিনীতি গ্রহণ কর।
(ঘ) "অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাহাদের পাও;....." (৯/৫)

অনুবাদকের টীকা ঃ এখানে 'হারাম মাস' বলতে সেই চার মাসকে বুঝাচ্ছে মোশরেকদের যার অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। এই অবকাশের সময়-কালের মধ্যে মোশরেকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে বৈধ ছিল না। এজন্য এই মাসগুলিকে হারাম মাস বলা হয়েছে।
(ঙ) "হে মুহাম্মদ, সেইদিন সম্পর্কে তুমি এই লোকদের ভয় দেখাও, যখন আযাব ইহাদিগকে গ্রাস করিবে। তখন এই যালেমরা বলিবে ঃ 'হে আমাদের রব্ব, আরো কিছু সময় অবকাশ দাও, আমরা তোমার দাওয়াতে সাড়া দিব ও নবী রসুলদের অনুসরণ করিব।' কিন্তু (তাহাদিগকে স্পষ্ট জওয়াব দেওয়া হইবে যে,) তোমরা কি সেই লোক নহ যাহারা ইতিপূর্বে কসম করিয়া বলিতেছিল যে, আমাদের তো কখনই পতন হইবে না?" (১৪/৪৪)
(চ) " আর যে ব্যক্তি আমার 'যিক্‌র' (উপদেশ-নসীহত) হইতে বিমুখ হইবে, তাহার জন্য দুনিয়ায় হইবে সংকীর্ণ জীবন, আর কেয়ামতের দিন আমরা তাহাকে অন্ধ করিয়া উঠাইব। (২০/১২৪)

"সে বলিবে ঃ 'হে খোদা, দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখন কেন আমাকে অন্ধ করিয়া তুলিলে? (২০/১২৫)

"আল্লাহতা'আলা বলিবেন ঃ 'হ্যাঁ, এমনি ভাবেই তো আমার আয়াতগুলি যখন তোমার নিকট আসিয়াছিল তুমি তখন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলে! ঠিক সেই রকমই আজ তোমাকেও ভুলিয়া যাওয়া হইতেছে।" (২০/১২৬)

"এই ভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং খোদার আয়াত অমান্যকারী লোকদেরকে (দুনিয়ায়) ফল দান করিয়া থাকি। আর পরকালের আযাব অধিক কঠোর ও স্থায়ী।" (২০/১২৭)

(ছ) "তোমরা যদি দেখিতে সেই সময়, যখন এই পাপীরা মাথা নত করিয়া নিজেদের খোদার সমীপে দাঁড়াইবে। (তখন তাহারা বলিতে থাকিবে) ঃ 'হে আমার খোদা! আমরা খুব ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে ফিরত পাঠাইয়া দাও। যেন আমরা সৎকাজ করিতে পারি। এখন আমাদের মনে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। (৩২/১২)

"(জওয়াবে বলা হইবে) ঃ 'আমরা চাহিলে পূর্বেই প্রত্যেক প্রাণীকে ইহার হেদায়াত দান করিতাম। কিন্তু আমার সেই কথা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহা আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দিয়া জাহান্নাম ভরিয়া দিব।" (৩২/১৩)

আমাদের সংযোজন ঃ এই আয়াতের ভাবার্থ কি তবে এরূপ ঃ ইচ্ছে করেই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা পূরণ করার জন্যে এমন দুই শ্রেণীর জীব (মানুষ ও জ্বিন) সৃষ্টি করেছিলেন যারা তাঁর প্রেরিত রসুলের কথা মানবে না, ফলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে সে-স্থান ভরে দেয়া হবে?

"অতএব এখন তোমরা তোমাদের এই কাজের স্বাদ গ্রহণ কর যে, তোমরা এই দিনের সাক্ষাত ভুলিয়া গিয়াছিলে। আমরাও এখন তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছি। চিরকালীন আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর নিজেদের কৃতকর্মের বিনিময়ে।" (৩২/১৪)

(জ) "তাহার চাইতে বড় যালেম কে হইবে যাহাকে তাহার খোদার আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দান করা হয় এবং তাহা সত্ত্বেও সে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে? এই সব পাপীদের উপর তো আমরা প্রতিশোধ লইয়াই ছাড়িব।" (৩২/২২)

(ঝ) "তাহাদের উপর চারিদিক হইতে লানত বর্ষিত হইবে। যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে ও নির্মমভাবে মারা হইবে।" (৩৩/৬১)

(ঞ) ".........পক্ষান্তরে কাফেররা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের স্বাদ-আনন্দ লুটিয়া লইতেছে, জন্তু জানোয়ারের মতই পানাহার করিতেছে, আর তাহাদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম।" (৪৭/১২)

আমাদের সংযোজন ঃ "কাফেররা জন্তু জানোয়ারের মতই পানাহার করিতেছে"; আর মুসলমানরা পৃথিবীর বুকে জিহাদ ঘোষণা করে কীরূপ জীবন যাপন করিতেছে?

(ট) "অতএব এই কাফেরদের সহিত যখন তোমাদের সম্মুখ-সংঘর্ষ সংঘটিত হইবে তখন প্রথম কাজই হইল গলাসমূহ কর্তন করা।..." (৪৭/৪)

হজরত মুহাম্মদ তাঁর সত্যদ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অসংখ্য সরল ও নিরপরাধ মানুষের তাজা রক্তে তাঁর পবিত্র হস্ত রঞ্জিত করেছেন এবং এর সব কিছুই তিনি করেছেন, মোহরবান খোদার নির্দেশে। তার পূর্ণ বিবরণ দেয়া এ-প্রবন্ধে অবকাশ নেই। শুধু কিছু নমুনা দেয়া হলো মাত্র। তা থেকেই বুঝা যাবে ইসলাম কত নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। পরিশেষে, আর একটি উদাহরণ না দিলে আমাদের বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। কীভাবে হজরত

মুহাম্মদ বানু কুরাইজা বংশের লোকদের (ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত) নিজের তত্ত্বাবধানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে শ্রী আনোয়ার শেখ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Islam, The Arab Imperialism"-এ যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হুবহু নিম্নে তুলে দিলাম।

"The besieged Jews, having suffered for twenty-five days, surrendered on the condition that their fate would be judged by Saad bin Muaadh, a chieftain of the Ansar. The Hadith no 4369 of the Sahih Muslim contains his judgement, which states, ".....kill their fighters and capture their women and children."

"The Jews were taken out from their fort, and like animals, were penned up in separate yards. They prayed all night to their Lord God for mercy while a long deep trench was being dug up by the zealous Muslims at the command of the Prophet. It was a mass grave for the jews, who had defied Muhammad to protect their faith, possessions, wives and children. As the sunrays were about to break through the curtain of darkness, the grave was ready to provide a last refuge to the victims of helplessness. Having said prayers to the Most Compassionate Allah, the Prophet, who claimed to be **Mercy for all beings**, took a seat by the dreadful pit to supervise the operation personally. The Jewish men were brought in bands of five or six, without knowing their destination. Each man, with his hands tied at the back, was commanded to lie down and stretch his neck over the bank of the ditch, where stood Ali and Zubair who removed heads from their bodies with massive swords. By dusk, the job was completed. **The pleasure of Allah and Muhammad led to the cold-blooded killing of 800 Jewish men, which in terms of today's inflated population, would equal 80,000 men. Their children were enslaved and women turned into concubines with a view to providing the faithfuls with the foretaste of paradisiac delights.**

"Among the Jewish women that fell to the Muslim faithfuls as spoils of the war, was an enchanting young beauty of twenty-two,

called Rihana, whose husband, parents and closest relations had just been massacred and buried at the prophet's command. He wasted no time in inviting her to accept his Prophethood and become one of his wives, but she failed to understand how the "Mercy for all beings" could make such a proposal when she was being choked by grief, pain and sorrow. When she refused to embrace Islam, the prophet took her for a concubine, which is an unmarried slave woman. The Islamic law allows the master to use her sexually, but treats her children as legitimate! The Prophet owned another concubine presented to him by the Governor of Egypt as a personal gift. Her name was Mary (Mariya); she bore him a son called 'Ibrahim', " (Ibid pp. 102-103)

And the Prophet's life is an example to the Momins! (33/21).

১৭। নারীজাতির প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

'সীরাতুন নবী'-র গ্রন্থকার লিখছেন, "যুগে যুগেই নারীজাতি ছিল উপেক্ষিতা ও নির্যাতিতা। এদের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা কেউ কোনদিন অনুভব করেছে বলেও বড় একটা জানা যায় না। হুযুর (সাঃ)-এর পূর্বে কোন ধর্ম প্রবর্তক বা সংস্কারক নারী জাতির প্রতি কোনরূপ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নারীদের সঙ্গে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ কেমন ছিল, তাও কোথাও উল্লিখিত নেই। ইসলামই সর্বপ্রথম নারী জাতিকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করেছে। উপেক্ষার অন্ধকার থেকে টেনে এনে সম-অধিকারের আলোকে উজ্জ্বল জীবন পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং ইসলামের নবী ব্যক্তিগতভাবে নারী জাতির প্রতি যতটুকু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সে সম্পর্কে সামান্য তথ্য অবগত হওয়া প্রয়োজন।" (পৃষ্ঠা ৬৯৫)

কুরআন ইসলামের সবচেয়ে প্রমান্য গ্রন্থ যাকে তারা শেষ কিতাব বলেও বিশ্বাস করেন। তাই আমরা সেই কিতাব থেকে কিছু আয়াত উদ্ধৃত করে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা করবো, ইসলামের নবী এবং তাঁর আল্লাহ্ নারী জাতির প্রতি কতখানি শ্রদ্ধাশীল এবং সংবেদনশীল ছিলেন।

(ক) "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্রের মত, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে— যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর—নিজেদের ক্ষেতে গমন কর।....." (২/২২৩)

(খ) "........নারীদের জন্যও সঠিকভাবে সেইরূপ অধিকারই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য পুরুষদের জন্য তাহাদের উপর একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে।...." (২/২২৮)

(গ) 'সীরাতুন নবী'র গ্রন্থকার বলছেন, "হজরত মুহাম্মদ এক খুত্‌বায় বলেন, '... বিয়ে এবং তালাকের অধিকার একান্তভাবেই স্বামীর'।" (ইবনে মাযাহ্‌, তালাক অধ্যায়। সীঃ নঃ পৃঃ ৬৯৪)

(ঘ) "অতঃপর (দুইবার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) যদি তালাক দেয়, তবে সে-স্ত্রী তার পক্ষে হালাল (বিবাহযোগ্য) হইবে না; অবশ্য তখন সে পুনরায় তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে, যদি অপর কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যায় এবং সে তালাক দেয়। তখন যদি সেই প্রথম স্বামী এবং স্ত্রীলোকটি মনে করে যে, তাহারা খোদার বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করিতে পরিবে, তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কোন দোষ নাই।......" (২/২৩০)

(ঙ) "তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যে-সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তন্মধ্য হইতে দুই দুই, তিন তিন, চার চারজনকে বিবাহ করিয়া লও। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাহাদের সহিত 'ইনসাফ' করিতে পারিবে না তাহা হইলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ কর; কিংবা সেইসব মেয়েলোকদেরকে স্ত্রীত্বে বরণ করিয়া লও যাহারা তোমাদের মালিকানাভুক্ত হইয়াছে; অবিচার হইতে বাঁচিবার জন্য ইহাই অধিকতর সঠিক কাজ।" (৪/৩)

(চ) "স্ত্রীদের মধ্যে পুরাপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা অন্তর দিয়া চাহিলেও তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব (খোদায়ী আইনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট যে), একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলাইয়া রাখিয়া অপরজনের দিকে একেবারে ঝুকিয়া পড়িবে না।..." (৪/১২৯)

(ছ) "তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারাই ব্যাভিচারে লিপ্ত হইবে, তাহাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী গ্রহণ কর। এই চারিজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে তবে তাহাদিগকে (স্ত্রীলোকদের) ঘরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখ—যতদিন না তাহাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ্‌ নিজেই তাহাদের জন্য কোন পথ বাহির করিয়া দেন।" (৪/১৫)

(জ) "সেই সব মেয়েলোকরাও তোমাদের প্রতি হারাম যাহারা অন্য কাহারো বিবাহাধীন রহিয়াছে; অবশ্য সেই সব স্ত্রীলোক ইহার বাহিরে যাহারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হইবে।".....(৪/২৪)

(ঝ) "পুরুষ স্ত্রীলোকদের পরিচালক এই কারণে যে, আল্লাহ্‌ তাহাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন, এবং এই জন্য যে, পুরুষ তাহার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব যাহারা সৎ মেয়েলোক তাহারা আনুগত্যপরায়না হইয়া থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতে আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাহাদের অধিকার রক্ষা করে। আর যেসব স্ত্রীলোকের বিদ্রোহী ভাবধারা সম্পন্না হওয়ার তোমরা আশংকা করিবে

তাহাদিগকে তোমরা বুঝাইতে চেষ্টা কর, বিছানায় তাহাদের হইতে দূরে থাক এবং তাহাদ্গিকে মারধর কর। অতঃপর তাহারা যদি তোমাদের অনুগত হইয়া যায়, তাহা হইলে শুধু শুধুই তাহাদের উপর নির্যাতন চালাইবার ছুতা তালাস করিও না।...." (৪/৩৪)

১৮। হজরত মুহাম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে চরম এক ভোগবাদের জীবন-দর্শন নিয়ে হজরত মুহাম্মদের আবির্ভাব ঘটে আরব ভূখণ্ডের মক্কা নামক জনপদে। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর নবুয়ত-প্রাপ্তি (Attainment of Prophethood) ঘটে। নবুয়ত-প্রাপ্তির পর তিনি মাত্র ২৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই ২৩ বছরের মধ্যে প্রথম ১৩ বছর তিনি মক্কায় ছিলেন, বাকী ১০ বছর মদিনায়। মক্কার জীবনে তিনি তাঁর নবলব্ধ দ্বীনের ব্যাপারে খুব একটা সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু মদনী জীবনে যে দশটি বছর তিনি কাটিয়েছেন, তা একদিকে যেমন ছিল ঘটনাবহুল অপরদিকে ছিল তেমনি রোমহর্ষক।

খৃষ্টীয় ৫৭১ অব্দের ২০শে এপ্রিল মক্কার এক সম্ভ্রান্ত কোরেশ পরিবারে হজরত মুহাম্মদের জন্ম হয়। যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই কোরেশ বংশ সহ তদানিন্তন মক্কার অধিবাসীরা ছিলেন সবাই পৌত্তলিক। তাদেরকে স্বমতে আনার জন্যে তিনি যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন; কিন্তু বিভিন্ন গোত্রের পৌত্তলিক মক্কাবাসীরা তাদের পূর্বপুরুষদের উপাসনা-পদ্ধতি বর্জন করে হজরত মুহাম্মদের পথে যেতে রাজি ছিলেন না। তাই হজরত মুহাম্মদ ও মক্কাবাসীদের মধ্যে সব সময়ই একটা অশান্তির অবস্থা বিরাজ করছিল। এমতাবস্থায় এমন একটা সময় এলো যখন হজরত মুহাম্মদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হলো। তখন সময় বুঝে একদিন তিনি তাঁর একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুগামী হজরত আবু বকরকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে গেলেন। এই চলে যাওয়াই ইসলামে 'হিজরত' নামে পরিচিত। প্রাসঙ্গক্রমে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। "রসুলে পাক (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় পবিত্র মক্কা ভূমি ছিল মূর্তিপূজার প্রধান প্রাণকেন্দ্র। পবিত্র কাবাগৃহেও ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল।" (সীরাতুন নবী, পৃষ্ঠা ৭৭)

মদিনায় হিজরতের সাথে সাথে হজরত মুহাম্মদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। যে-কথা বা যে-কাজ তিনি মক্কায় থাকা কালে বলতে বা করতে পারতেন না, মদিনায় এসে তার অনেকটাই বলতে বা করতে পারছিলেন। এর একটা কারণও ছিল। হজরত মুহাম্মদ যখন মক্কায় ছিলেন তখন কিছু লোক গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করতো। অনতিবিলম্বেই যখন সেসব ঘটনা জানাজানি হয়ে যেতো তখন প্রাণের ভয়ে তারা মক্কা ছেড়ে যে-সব দেশে চলে যেতো তার মধ্যে মদিনা ছিল অন্যতম। তাই হজরত মুহাম্মদ যখন মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় এলেন, তখন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় পালিয়ে এসেছিল, তাদের সমর্থন পেলেন এবং তাদের নেতৃত্ব দিলেন।

মদিনায় এসে আর যাদের সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন তারা হলো, মদিনার একশ্রেণীর ইহুদি, যারা ধনিকগোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত ও নানাভাবে উৎপীড়িত হতো। পরবর্তীকালে ইসলাম যে 'সুদ' হারাম বলে ঘোষণা করেছিল তার সূচনাও হয় মদিনার ইহুদিদের ইসলামের দিকে টানার জন্যেই।

মোটামুটি পূর্বোক্ত দুটি কারণে এবং স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তা ও কর্মকুশলতার দ্বারা হজরত মুহাম্মদ মদিনায় তাৎক্ষণিক না হলেও ক্রমান্বয়ে নিজের আধিপত্য-বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে কাজটি যে সহজসাধ্য ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। ইসলামকে আরব ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হজরত মুহাম্মদকে তাঁর প্রতিপক্ষের সাথে অসংখ্য যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে দু'টি যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একটি বদর যুদ্ধ (দ্বিতীয় হিজরী), অপরটি মক্কা-বিজয়ের যুদ্ধ (অষ্টম হিজরী)। দু'টি যুদ্ধই হজরত মুহাম্মদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বদর-যুদ্ধে যদি হজরত মুহাম্মদ জয়ী না হতেন তবে, ঐতিহাসিকদের মতে, ইসলাম আর কোনদিন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারতো কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। বদর যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ফলে হজরত মুহাম্মদ অনতিবিলম্বেই মদিনায় একটি ক্ষুদে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিন থেকে ইসলামের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল তার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছিল অষ্টম হিজরীতে মক্কা-বিজয়ের মধ্য দিয়ে। এরপর আর ইসলামকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

হজরত মুহাম্মদ যখন ২৫ বছরের যুবক তখন তাঁর প্রথম বিবাহ হয় হজরত খাদিজার (৪০) সাথে। ৬৫ বছর বয়সে হজরত খাদিজার মৃত্যু ঘটে। হজরত মুহাম্মদের জীবনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, তাঁর পালিতপুত্র হজরত যায়েদের (যে একসময় মুহাম্মদের একান্ত অনুগত দাস-ভৃত্য ছিল) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হজরত যয়নবের সাথে বিবাহ। এই বিবাহকে কেন্দ্র করে দু'টি বিবরণ প্রচলিত আছে। যেহেতু বিবরণ দু'টির কোনটিই সুস্থ অথবা তর্কাতীত নয়, তাই আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না। তবে যদি কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছে করেন, তিনি 'সীরাতুন নবী'-শির্ষক পুস্তকটির ২৬৩-২৬৫ নম্বর পৃষ্ঠা ক'টিতে যে বিবরণ দেয়া আছে তা পড়ে দেখতে পারেন। তাঁর বিবাহিত জীবনের আরও একটি ঘটনা আছে যা উল্লেখযোগ্য। সেটি হলো, হজরত আয়েশার সাথে তাঁর বিবাহ। ইনি হজরত আবু বকরের কন্যা। 'সীরাতুন নবী'র বর্ণনায় শুনুন ঃ "নবুয়াতের দশম বর্ষে রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর সঙ্গে বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর।" (সীঃ নঃ পৃঃ ৭১২)। "হজরত আয়েশা" (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ৯ বছর দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। তিনি ৯ বছর বয়সে স্বামীর ঘরে এসেছিলেন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন এন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর।" (সীঃ নঃ পৃষ্ঠা ৭১৩)। হজরত মুহাম্মদের মৃত্যুর সময় যে নয়জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন হজরত আয়েশা। কুরআন মজীদের অনুবাদকের বিবরণ থেকে হজরত মুহাম্মদের জীবনের আর একটি দিক আমরা

জানতে পারি। যখন তিনি দূর দেশে সফরে যেতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোন এক জনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বেশীদিনের যুদ্ধযাত্রার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম ছিল। বনীল-মুস্তালিক যুদ্ধের সময় হজরত আয়েশা তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন। (কুরআন মজীদ, পৃষ্ঠা ৫৯২)।

মধ্যপ্রাচ্যে যে তিনজন পয়গম্বর যেমন মুসা, ঈশা এবং মুহাম্মদ এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হজরত মুহাম্মদই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাঁর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্যে হিংসার পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং প্রতিপক্ষের সাথে অসংখ্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং সাধারণ অস্ত্রাগার বাদে তাঁর ব্যক্তিগত অস্ত্রভান্ডারে যে-সব অস্ত্রসস্ত্র ছিল তার একটি বিবরণ দেয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'সীরাতুন নবীর' রচয়িতা হজরত মুহাম্মদের অস্ত্রভান্ডারের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় ঃ "জীবনকে সুখকর করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখলেও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম থেকে সারওয়ারে কায়েনাত (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত ভাণ্ডার মোটেও শূন্য ছিল না। বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে সে সমস্ত অস্ত্রসস্ত্রের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ ঃ আটটি তলোয়ার, নাম— মা'সুর, আসাব, যুলফিকার, ক্বালয়ী, তুবার, হাতাফ, আখ্‌যাম ও ক্বাযীব।

"মা'সুর নামক তলোয়ারটি তিনি পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে পেয়েছিলেন। যুলফিকার বদর যুদ্ধে পাওয়া। এর হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর হাতে যে তলোয়ারটি ছিল, তার হাতল ছিল স্বর্ণনির্মিত।

"সাতটি বর্ম। নাম ঃ যাতুল ফযুল, যাতুল বেশাহ্‌, যাতুল হাওয়াশী, সাদীয়া ও ফিয়যা। এতদ্ব্যতীত ছিল তেরটি যরনক (কুঠার জাতীয় অস্ত্র)। শেষ বিদায়ের সময় যাতুল ফযুল নামক বর্মটি ত্রিশ সা' পরিমাণ গমের পরিবর্তে এক বছরের জন্য জনৈক ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল। আরবে তখনকার দিনে চামড়ার নির্মিত বর্মের প্রচলন থাকলেও হুযুর (সাঃ) -এর সব কখানি বর্মই ছিল লৌহ নির্মিত।

"ছয়টি ধনুক। নাম ঃ যাওরা, রাওহা, সাফরা, বাইয়া, কাতুম ও শাদ্দাদ। .... তীর রাখার একটি তুনীর ছিল। তার নাম ছিল কাফুর।....

"একটি ঢাল,নাম ছিল যালুক।

"পাঁচটি বর্শা ঃ লৌহনির্মিত দু'টি শিরস্ত্রাণ, নাম —মোয়াশশাহ্ ও সাবুগ।

"যুদ্ধের সময় পরার উপযোগী তিনটি জুব্বা ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল কাঁচা রেশম নির্মিত সবুজ রং-এর।

"দু'টি পতাকা ঃ একটি ছিল গাঢ় কালো রং-এর যার নাম ছিল উক্কাব এবং অপরটি সাদা ও জরদ রং-এর ডোরা বিশিষ্ট।" (সীঃ নঃ, পৃষ্ঠা ৫২৫)।

"বিদায় হজের সময় হুযুর (সাঃ) মাথার কেশ মুন্ডন করার পর মুণ্ডিত কেশরাজি

ভক্তবৃন্দের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। .....'' (সীঃ নঃ, পৃষ্ঠা ৫২৬)।

একাদশ হিজরীতে (মে, ৬৩২, খৃঃ অঃ) হজরত মুহাম্মদের কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটে।

১৯। বিবাহ্ ও দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে রসুলের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষপাতিত্ব

সরিয়তি নিয়ম অনুযায়ী মুসলমানরা চারজন স্ত্রীলোককে একসাথে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারেন, তার বেশী নয়। তবে আল্লাহ্‌র রসুল হজরত মুহাম্মদের ক্ষেত্রে এ-নিয়ম প্রযোজ্য নয়। নিম্নে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতসমূহে তা স্পষ্ট। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ঃ আল্লাহ্ কেন এরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণ করলেন? কেনইবা তিনি নিজের সিলমোহর এঁকে দিয়ে হজরত মুহাম্মদের সব কাজ হালাল অর্থাৎ বৈধ করে দিলেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু সে-ভার মোল্লা-মৌলবীদের উপর ছেড়ে দিয়ে আপাততঃ আল্লাহ্‌র বিচারের দিকে দৃষ্টি ফেরাবো। সুরা আহযাব-এর পরপর তিনটি আয়াতে (৫০, ৫১ ও ৫২) আল্লাহতা'আলা তাঁর রসুলকে বলছেন ঃ

(ক) ''হে নবী, আমরা তোমার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছি তোমার সেই স্ত্রীদিগকে, যাহাদের মোহরানা তুমি আদায় করিয়া দিয়াছ, সেই মহিলাদিগকেও (হালাল করিয়াছি,) যাহারা খোদার দেওয়া দাসীদের মধ্য হইতে তোমার মালিকানাভুক্ত হইয়াছে, তোমার সেই চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, ও খালাতো ভগ্নিদিগকেও (হালাল করিয়াছি), যাহারা তোমার সহিত হিজরত করিয়া আসিয়াছে। সেই মু'মেন নারীও যে নিজে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করিয়াছে— যদি নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। এই সুবিধাদান খালেসভাবে তোমারই জন্য; অন্য ঈমানদার লোকদের জন্য ইহা নয়। আমরা জানি, সাধারণ মু'মেন লোকদের জন্য তাহাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি সব বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া দিয়াছি। (তোমাকে এই বিধিনিষেধ হইতে আমরা এই জন্য ঊর্দ্ধে রাখিয়াছি) যেন তোমার পক্ষে কোন সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে; আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'' (৩৩/৫০)

(খ) ''তোমাকে এই ইখতিয়ার দেওয়া যাইতেছে যে, তোমার স্ত্রীদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া রাখ, যাহাকে চাও নিজের সঙ্গে রাখ আর যাহাকে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া রাখার পর নিজের নিকট আনিয়া রাখ। এই ব্যাপারে তোমার কোনই দোষ নাই। এইভাবে অধিকতর আশা করা যায় যে, তাহাদের চক্ষু শীতল থাকিবে এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না। আর যাহা কিছু তুমি তাহাদিগকে দিবে তাহাতেই তাহারা সকলে সন্তুষ্ট থাকিবে। আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু তোমাদের দিলের মধ্যে রাহিয়াছে, আর আল্লাহ্ জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল।'' (৩৩/৫১)

(গ) 'ইহাদের পরে তোমার জন্য অপর মহিলারা হালাল নয়, আর ইহাদের স্থানে অপর

স্ত্রী গ্রহণ করাও অনুমতি নাই; তাহাদের রূপসৌন্দর্য তোমার যতই মনমতো হউক না কেন। অবশ্য দাসীদের অনুমতি তোমার জন্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের পাহারাদার।' (৩৩/৫২)

২০। রসুলের জীবন মু'মিনদের নিকট আদর্শ

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য খোদার রসুলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান ছিল এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশী করিয়া খোদার স্মরণ করে।" (৩৩/২১) অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদের জীবন ছিল মু'মিনদের নিকট আদর্শস্থানীয় যা প্রত্যেক মুসলমানের অনুসরণ করা উচিত। তাই কীভাবে তিনি জীবন-যাপন করতেন তার প্রধান প্রধান অংশগুলি তুলে ধরার প্রয়োজন আছে।

(ক) পৃথিবীর মাটিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে বদর যুদ্ধ ও মক্কা-বিজয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(খ) তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর সেনাপতি এবং যোদ্ধা ছিলেন। জিহাদের সময় তাঁর দুর্দ্ধর্ষ সৈনাপত্যের প্রয়োজন ছিল।

(গ) তিনি বহুবিবাহের প্রবর্তক। মৃত্যুকালে তাঁর হারেমে অর্থাৎ অন্তঃপুরে স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল নয় (৯)। কেউ বলেন, আরো বেশী। আমরা সেদিকে যাবো না।

(ঘ) 'হারেমে'র প্রচলনও তিনিই করেন।

(ঙ) জিহাদ-লব্ধ 'মালে গণীমতের' এক পঞ্চমাংশ তিনি গ্রহণ করতেন। তা দিয়ে তিনি নিজের, নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন এবং দীন-দুঃখীদের অভাব মেটাতেন। (৮/৪১) বাকী চার পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। (সীঃ নঃ, পৃষ্ঠা ৩৮৩)। সরিয়তি মতে গণীমত-বন্টনের এটাই রীতি।

(চ) মেয়েমানুষ সহ সকল রকম উপঢৌকন তিনি গ্রহণ করতেন। একবার মিশরের শাসনকর্তা মুকাউকিস হজরত মুহাম্মদকে কিছু উপঢৌকন পাঠান। তার মধ্যে ছিল "দু'টি কিশোরী, কিছু বস্ত্র এবং আরোহনের জন্য একটি খচ্চর।.....তিনি যে কিশোরী দু'টি পাঠিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মারিয়া কিত্‌বিয়া (রাঃ)। হযরত (সাঃ) তাঁকে নিজ হরম বা অন্তঃপুরের অন্তর্ভুক্ত করেন। দ্বিতীয় জনের নাম শিরীন (রাঃ)। তাঁকে হযরত হাসসান-এর হাতে সমর্পণ করা হয়। খচ্চরটির নাম ছিল দুল দুল। হাদীস গ্রন্থে প্রায়ই এর নাম উল্লেখ থাকে। এতে আরোহন করে হুযুর (সাঃ) খয়বারের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ইতিহাস-বেত্তা তাবারি উল্লেখ করেছেন, —মারিয়া এবং শিরীন সহোদরা বোন ছিলেন। ...রসুলে খোদা (সাঃ) হযরত মারিয়াকে বিয়ে করেছিলেন, বাঁদী হিসাবে তিনি তাঁর অন্তঃপুরে স্থান দেননি। (সীঃ নঃ, পৃষ্ঠা ২৮৭-৮৮)।

(ছ) সাধারণ অস্ত্রভাণ্ডার বাদেও তাঁর নিজস্ব একটি অস্ত্রভাণ্ডার ছিল। হজরত মুহাম্মদের

জীবনী অধ্যায়ে তার একটি তালিকা দেয়া হয়েছে।

(জ) সর্বোপরি, হজরত মুহাম্মদ ছিলেন ভোগবাদের এক মূর্ত প্রতীক। একদিকে পৃথিবীতে যতোপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী আছে তা অধিকারের জন্যে তিনি তাঁর অনুগামীদের সতত উদ্বুদ্ধ করতেন; অপর দিকে, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে আল্লাহ্ জান্নাতে যেসব ভোগ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছেন তার রঙিন চিত্র তুলে ধরতেন। দিনের পর দিন, ভোগবাদের এবং-প্রকার হাতছানিকে উপেক্ষা করে কতজন মনুষ্যসন্তানের পক্ষে সুস্থ দেহমন নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব? এর নামই 'সত্য দ্বীন'?

(ঝ) হজরত মুহাম্মদ যখন সফরে যেতেন কিংবা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে বাইরে থাকতেন, তখৰ তাঁর বিবিদের মধ্যে একজনকে সাথে করে নিয়ে যেতেন। (কুঃ মঃ, পৃঃ ৫৯২)।

(ঞ) পরিশেষে কুরআন শরীফের (৩৩/২১ নং আয়াতের) জের টেনে বলতে চাই, একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পর করে (যেখানে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা কিংবা পাশ কাটিয়ে চলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়) পৃথিবীর বেশীর ভাগ মুসলমান আজ-ও হজরত মুহাম্মদের নির্দেশিত পথে চলছেন, তার একমাত্র কারণ, ইসলামের ভোগবাদী জীবন-দর্শন।

২১। বিবিধ প্রসঙ্গ

(ক) যাকাতের মাল কাফেরদের মন জয় করার জন্যে ব্যয় করা যেতে পারে। "এই সাদকাসমূহ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য, আর তাহাদের জন্য যাহারা সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত এবং তাহাদের জন্য যাহাদের মন জয় করা হইল উদ্দেশ্য।" (৯/৬০)।

অনুবাদকের টীকা ঃ ".... এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ যারা ইসলামের বিরোধীতায় তৎপর যদি অর্থ দিয়ে তাদের শত্রুতাপূর্ণ উদ্দীপনা স্তিমিত করা যায়, কিংবা যদি কাফেরদের দলে এরূপ লোক থাকে যাদের অর্থদান করলে তারা কাফেরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের সাহায্যকারী হতে পারে কিন্তু যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে ও তাদের দুর্বলতা দেখে আশঙ্কা হয়, যদি অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করা না হয় তবে আবার তারা কুফরীতে ফিরে যাবে—এইরূপ লোকদের স্থায়ী বৃত্তি বা সাময়িক দান ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে ইসলামের সমর্থক ও সহায়ক বা অনুগত বা কমপক্ষে তাদের থেকে অনিষ্টের আশাঙ্কা না থাকে এরূপ নিস্ক্রিয় শত্রুতে পরিণত করা।" এর পর যাকাতের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান ভারত এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(খ) বদর যুদ্ধ ঃ এটি সংঘটিত হয় হজরত মুহাম্মদ মদিনায় পালিয়ে আসার দ্বিতীয় হিজরীতে। মক্কার নিজবংশ কোরেশদের সাথে এটিই ছিল তাঁর প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর-ই নির্ভর করছিল হজরত মুহাম্মদের নবলব্ধ দ্বীন ইসলাম পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা পাবে, না আর দশটা বিশ্বাসের মতো কালের গতিতে হারিয়ে যাবে। এতোই গুরুত্ব

ছিল এই বদর যুদ্ধের। প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ বদর-যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সাথে ইসলামের উত্থান-পতনের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় বা কতখানি? উত্তরে শুধু একটি কথাই বলবো ঃ ইসলাম জোর-জুলুমে বিশ্বাসী। তাই তার প্রবর্তক হজরত মুহাম্মদ চেয়েছিলেন, তাঁর নবলব্ধ দ্বীনকে বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসীদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে (যে-পদ্ধতিকে তারা সগৌরবে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন)। কিন্তু কোরেশরা তাতে বাধ সাধলো, বাধা দিলো এবং শেষ পর্যন্ত এই বদর নামক স্থানে হজরত মুহাম্মদকে মুকাবিলা করলো। কিন্তু কোরেশরা পারলো না, হজরত মুহাম্মদের কূটকৌশল ও যুদ্ধোদ্যোগের কাছে পরাজিত হলো। সাথে সাথ মানব-সভ্যতার গতিপথ আর একবার নতুন পথে মোর নিলো। তাই ইসলাম-প্রসঙ্গ আলোচনার সময় বদর যুদ্ধের উল্লেখ না থাকলে সে-আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য।

(গ) পিতামাতার সাথে সম্পর্ক— কুরআন বলছেন ঃ "....পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। তোমাদের নিকট যদি তাহাদের কোন একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাহাদেরকে 'উহু!' পর্যন্ত বলিবে না ঃ তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে না; বরং তাহাদের সহিত বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলিবে।" (১৭/২৩)

"আমরা মানুষকে পথ নির্দেশ দিয়াছি যে, তাহারা যেন নিজেদের পিতা-মাতার সহিত নেক্ আচরণ করে। তাহার মাতা কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে গর্ভে রাখিয়াছে এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াই তাহাকে প্রসব করিয়াছে। তাহার গর্ভধাবণে ও দুধ পান ত্যাগ করানোয় ত্রিশ মাস অতিবাহিত হইয়াছে।...." (৪৬/১৫)

কিন্তু "হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেদের পিতা ও ভাইকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না যদি তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে। তোমাদের যে লোকই এই ধরণের লোকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে-ই যালেম হইবে।" (৯/২৩)

আমাদের সংযোজন ঃ এই আয়াতের 'ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে' বাক্যাংশটির একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, নতুবা ভুল বুঝার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ঈমান ও কুফর শব্দ দু'টিকে সাধারণ অর্থে না ধরে ধরতে হবে, ঈমান-অর্থে ইসলাম ও কুফর-অর্থে ইসলাম-ভিন্ন অন্য কোন পন্থ-কে। সুতরাং এই বাক্যাংশটির পরিবর্তিত অর্থ দাঁড়াবে ঃ 'ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন পন্থকে অধিক ভালবাসে।'

(ঘ) ইসলাম গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়— "এবং হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে খোদার পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিবে।...." (৬/১১৬)

"খুব ভাল করিয়া জানিয়া রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসুল বর্তমান। সে যদি বহুসংখ্যক ব্যাপারে তোমাদের কথা মানিয়া লইতে শুরু করে তাহা হইলে তোমরা নিজেরাই কঠিন অসুবিধার মধ্যে ফাঁসিয়া যাইবে।...." (৪৯/৭)

উপরে উদ্ধৃত আয়াত দুটিতে আল্লাহ্ তাঁর রসুলের প্রতি এবং বান্দাহ্দের প্রতি যথাক্রমে নির্দেশ দিচ্ছেন, রসুল যেন বেশী সংখ্যক লোকের কথা মেনে না চলেন এবং জনগণ যেন রসুলকে বেশী সংখ্যক লোকের কথা বা মতামত মেনে চলতে বাধ্য না করে। এর সরল অর্থ দাঁড়ায়, রসুল যেন বেশী সংখ্যক লোকের কথা মেনে না চলেন (যা গণতন্ত্রের প্রাণ বা গোড়ার কথা), তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই যেন করেন অথবা সে-মতই যেন সিদ্ধান্ত নেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার ঃ ইসলাম বা মুহাম্মদপন্থীরা জাগতিক কোন নিয়মকানুনের উপর বিশ্বাসী নয় এবং তা মেনে চলতেও বাধ্য নয়—তারা একমাত্র আসমানী কিতাবে অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত নিয়মকানুনে বিশ্বাসী এবং সে-কিতাবে যা লেখা আছে বা বর্ণনা করা আছে তা-ই শেষ কথা। সুতরাং মুখে যাই বলুন, কার্যতঃ মুসলমানরা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন, তা উদ্ধৃত আয়াত দু'টির চেয়ে অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন আছে কি?

২২। কূটনীতিবিদ হিসেবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভূমিকা অনন্য

আমরা জানি, আল্লাহ্ সব জানেন, সুবিবেচক এবং সর্বশক্তিমান। কিন্তু তিনি যে একজন বিচক্ষণ কূটনীতিবিদও বটেন, সেকথা আমরা অনেকেই জানিনা। মানুষের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কোথায় আঘাত করলে মনুষ্য-সন্তান ব্যথা পাবে, কীভাবে ভীতি প্রদর্শন করলে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে এবং কোথায় ও কীভাবে প্রলেপ বা সুরসুরী দিলে খুশী বা আহ্লাদিত হবে সে-সব কথা স্বয়ং আল্লাহ্র চেয়ে আর কে বেশী জানতেন বা জানেন? তার স্বাক্ষর আমরা কুরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় দেখতে পাই।

কুরআনের মূল সুর বা কথা একটিই—হয় আল্লাহ্র তরফ থেকে তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদের নিকট নাযিল হওয়া আয়াতসমূহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর, নতুবা চিরদিনের মতো জাহান্নামে যাও। 'রোজ কেয়ামতে' (শেষ বিচারের দিনে) কাফেরদের জন্যে কোন সাহায্যকারীই পাওয়া যাবে না বা থাকবে না; পক্ষান্তরে, ইসলামের অনুগামীদের জন্যে থাকবে জান্নাত-জীবনের বাদসাহী জীবন-যাপন। এসব কথা কুরআনের অনেক আয়াতে সোজাসুজি নাযিল হয়েছে, আবার কোন কোন আয়াতে বিশেষ চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় নাযিল হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে-সব আয়াত চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় নাযিল (অবতীর্ণ) হয়েছে, আমরা তা থেকে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করবো।

(ক) কলেমা ও রোজ কেয়ামত ঃ কলেমার সাথে রোজ কেয়ামতের আঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকার কলেমার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু হজরত মুহাম্মদের পর আর কোন নবী আসবেন না অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী, তাই মনে হয়, কেয়ামতও (অর্থাৎ শেষ বিচারের দিনও) একবারই আসবে। প্রশ্ন উঠতে পারে ঃ হজরত মুহাম্মদের পূর্বে যে-সব নবী রসুলদের পাঠানো হয়েছিল তাঁদের কেউ শেষ নবী ছিলেন না—একজনের পর একজন আসতেন। তাই সেইসব নবী রসুলদের যারা অস্বীকার করতো,

তাদের শাস্তি দেবার জন্যে কোন 'কেয়ামতে'র ব্যবস্থা ছিল না—সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ ইহজগতেই তাদের বিচার হয়ে যেতো এবং যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। এখানে সুরা আলক্বামার-এর (৫৪) উল্লেখ করা যেতে পারে। সুরা আলক্বামারে পাঁচটি জাতির উল্লেখ আছে যারা তাদের সংশ্লিষ্ট নবীকে অস্বীকার ও অমান্য করেছিল (যেমন ন্যুয়ের জাতি, আদ-এর জাতি, সামুদ জাতি, লুতজাতি ও ফেরাউনের লোকজন)। এই অমান্য করার ফলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল। যেহেতু তাঁদের কেউ শেষ নবী ছিলেন না তাই তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের কেয়ামতের শাস্তির জন্যে অপেক্ষা করতে হয়নি, অমান্য করার অপরাধে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পেতে হয়েছিল। এখানে আবার প্রশ্ন উঠবে ঃ যারা শেষ নবী অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদকে অস্বীকার করেছে বা করবে তাদের শাস্তির জন্যে 'রোজ কেয়ামত' অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন কবে সংঘটিত হবে?

(খ) 'রোজ কেয়ামত' কবে সংঘঠিত হবে ? "চূড়ান্ত বিচারের দিন একটা পূর্ব নির্দিষ্ট দিন" (৭৮/১৭)। "এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ঃ আচ্ছা, সেই কিয়ামতের সময়টি কখন আসিবে? বল ঃ 'ইহার জ্ঞান কেবলমাত্র আমার খোদার নিকটই রহিয়াছে, উহাকে উহার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তিনিই প্রকাশ করিবেন। আসমান ও যমীন তাহা বড় কঠিন দিন হইবে। উহা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়িবে'।" (৭/১৮৭)

"বল ঃ 'তোমাদের জন্য এমন এক দিনের মীয়াদ নির্দিষ্ট রহিয়াছে, যাহার আসার ব্যাপারে তোমরা না এক মুহূর্তের বিলম্ব করিতে পারিবে, আর না এক মুহূর্ত আগে উহাকে আনিতে পারিবে।" (৩৪/৩০)

"পরে এক শিংগায় ফুঁক দেওয়া হইবে। আর সহসা তাহারা নিজেদের খোদার সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য নিজেদের কবর সমুহ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে।" (৩৬/৫১)

"ভীত শংকিত হইয়া বলিবে! 'হায়রে! আমাদিগকে কে আমাদের শয়ন-স্থল হইতে উঠাইয়া দাঁড় করাইয়া দিল?'—ইহা সেই জিনিস, দয়াময় আল্লাহ যাহার ওয়াদা করিয়াছিলেন। আর নবী-রসুলগণের কথা তো সত্যিই ছিল।" (৩৬/৫২)

উপরে উদ্ধৃত আয়াতসমুহ থেকে একটি কথা বেশ পরিস্কার যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট একটা দিন আল্লাহ্ ঠিক করে রেখেছেন। তবু তিনি নিম্নের আয়াতসমূহে পরিস্কার করে কিছু বলছেন না। একজন দক্ষ কূটনীতিবিদের ন্যায় তিনি তাঁর বক্তব্য রাখছেন।

"আমরা সেই দিনকে আনিতে খুব বেশী বিলম্ব করিতেছি না; মাত্র কয়েকটি গননা করা দিনের সময়ই উহার জন্য নির্দিষ্ট।" (১১/১০৪)

"....কেয়ামত কায়েম হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না; শুধু এতটুকু সময় মাত্র লাগিবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে, বরং ইহারও কম।....." (১৬/৭৭)

"তাহারা মাথা নাড়াইয়া নাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিবে 'আচ্ছা বুঝিলাম, কিন্তু ইহা ঘটিবে

কবে?' তুমি বল ঃ 'কি বলা যায়—সে সময়টি অতি নিকটবর্তীও হইতে পারে'।" (১৭/৫১)

"অতি নিকটে আসিয়া গিয়াছে লোকদের হিসাব-নিকাশের সময়, অথচ তাহারা এখনো গাফলতের মধ্যে বিমুখ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।" (২১/১)

"লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় কখন আসিবে? বল ঃ উহার জ্ঞান তো আল্লাহর নিকট রহিয়াছে; তুমি কি করিয়া জানিবে। সম্ভবতঃ উহা খুব নিকটেই উপস্থিত হইয়া গিয়াছে।" (৩৩/৩৬)

"....তুমি কি জানো সম্ভবতঃ ফয়সালার সময়টা অতি নিকটেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে?" (৪২/১৭)

উদ্ধৃত আয়াতসমূহ পাঠ করার পর কেউ যদি সিদ্ধান্তে আসে যে, এখানে যে-সব বক্তব্য রাখা হয়েছে তার একটি মাত্রই উদ্দেশ্য এবং সেটি হলো কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করা যাতে তারা মুহূর্তমাত্র কালবিলম্ব না করে ইসলামে সামিল হয়, তাহলে কি সেই পাঠক বিন্দুমাত্রও ভুল করবে?

(গ) "এমন কখনই হয় নাই যে, আমরা কোন লোকালয়ে নবী পাঠাইয়াছি; অথচ সেই লোকালয়ের লোকদিগকে প্রথমে অভাব ও কষ্টে নিমজ্জিত করি নাই—এই আশায় যে, তাহারা হয়ত নম্র ও কাতর হইয়া আসিবে।" (৭/৯৪)

ইসলামে সামিল করার জন্যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এই আয়াতটিতে যে-ধরণের চাতুর্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে তা সত্যিই নজিরবিহীন বললে, বোধ হয়, ভুল বলা হবে না। একজন সাধারণ কাফের হয়ে ভাবতে অবাক লাগে, সত্যদ্বীন ইসলামকে কাফেরদের গলাধঃকরণের জন্যে মেহেরবান খোদা কীভাবে এতো নিষ্ঠুর হতে পারেন!

(ঘ) মক্কা এবং মদিনায় নাযিল হওয়া আয়াতসমূহে এরূপ মৌলিক পার্থক্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের বেশী দূর যেতে বা কষ্ট করতে হবে না। মাক্কী জীবনে আল্লাহ্‌র রসুলকে খুব সাবধানে জীবনযাপন করতে হতো। তাঁর জাতির সবাই ছিল পৌত্তলিক, আর হজরত মুহাম্মদ ছিলেন একা। নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম ১৩ বছর, যখন তিনি মক্কায় ছিলেন, হজরত মুহাম্মদকে খুব ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো। কারণ, তাঁর নিজ জাতির লোকেরা তখন নানাভাবে তাঁকে ভীতি-প্রদর্শন করতো। আল্লাহ্ এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাই তিনি তাঁর রসুলের নিকট 'ধীরে চলার' আদেশ দিয়েছিলেন। এবং খুব নরম নরম আয়াত নাযিল করতেন। উদাহরণস্বরূপ সুরা আলগাশিয়ার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সুরাটিতে অন্যান্য আয়াতের মধ্যে, আল্লাহ্ বলছেন "সে যাহাই হউক, (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমি তো একজন উপদেশকারী মাত্র। ইহাদের উপর জবরদস্তিকারী তো নও।" (৮৮/২১-২২)। অন্যত্র বলছেন, "হে নবী! তোমাকে তো আমরা শুধু একজন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক বানাইয়া পাঠাইয়াছি।" (২৫/৫৬)। অথবা,

"ইহারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলিয়া অমান্য কবে তাহা হইলে বলিয়া দাও যে, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যাহা কিছু করি তাহার দায়িত্ব হইতে তোমরা মুক্ত। আর যাহা কিছু তোমরা করিতেছ তাহার দায়িত্ব হইতে আমি মুক্ত।" (১০/৪১)

মাক্কী-জীবনে এরূপ অসংখ্য আয়াত আছে। নমুনাস্বরূপ এখানে মাত্র তিনটি আয়াত তুলে দেয়া হলো। কিন্তু যেইমাত্র আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রাণের ভয়ে মক্কা থেকে মদিনায় চলে যেতে হলো ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে তিনি নতুব জীবনের অধিকারী হলেন। এবং মদিনায় চলে আসার পর হজরত মুহাম্মদ যেমন যেমন শক্তি সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলেন, আল্লাহ্‌-ও ঠিক তার সাথে তাল রেখে সময়োপযোগী ক্রমান্বয়ে কঠোর কঠোর আয়াত নাযিল করতে লাগলেন। দু'একটি উদাহরণ দিলেই তা বুঝা যাবে। বেশী আয়াত এখানে উদ্ধৃত করবো না। কারণ, যথাস্থানে আমাদের এরূপ অনেক আয়াত উদ্ধৃত করতে হয়েছে বা হবে। একটি আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলার নিকট যমীনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হইতেছে সেই সব লোক যাহারা মহাসত্যকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে; পরে তাহারা কোন প্রকারেই তাহা কবুল করিতে প্রস্তুত হয় নাই;" (৮/৫৫) উল্লেখ্য ঃ এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর। এই যুদ্ধে কোরেশদের উপর হজরত মুহাম্মদ বিজয়ী হন এবং এই যুদ্ধ-জয়ের মধ্য দিয়েই ইসলামের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। এর পর আর-ও একটি কঠোর আয়াতের উল্লেখ করবো, যে আয়াতে ইসলামকে বিশ্বজয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে এই আয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম ঃ

"আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করিয়া লইয়াছেন।" (২২/৭৮)

(ঙ) কাফেরদের সাথে কখন, কীভাবে এবং কতক্ষণ সহাবস্থান চলতে পারে ? কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (মাক্কী জীবনে নাযিল হওয়া আয়াত বাদে) বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যম আমরা জানতে পারি, কাফেরদের সাথে অর্থাৎ অমুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব কিংবা সহাবস্থান কখনই সম্ভব নয়। যে-সব মুসলমান তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা আর মুসলমান থাকবে না, বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে এর-ও ব্যতীক্রম আছে। মু'মিনরা অর্থাৎ মুসলমানরা যেখানে সংখ্যায় কম, সেখানে তারা অমুসলমানদের সাথে সাময়িকভাব লোকদেখানো বন্ধুত্বের ভান করতে পারে এবং ক্ষেত্রবিশেষে মন যুগিয়েও চলতে পারে, কিন্তু মনের দিক থেকে তা কখনই করা যাবে না; কারণ অমুসলমানরা হলো 'নিকৃষ্টতম জীব'। ব্যাপারটি আরও একটু পরিস্কার হওয়া দরকার। সংখ্যার দিক দিয়ে মু'মিনরা অর্থাৎ মুসলমানরা যতক্ষণ না তাদের নির্দিষ্ট আনুপাতিক সংখ্যায় উপনীত হচ্ছে ততক্ষণ তারা চুপচাপ থাকবে; কিন্তু যেইমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে তারা তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যায়

উপনীত হবে বা পৌঁছুবে, তখনই তারা কাফেরদের সাথে বাহ্যতঃ বন্ধুত্বের মুখোশ ঝেড়ে ফেলে স্বমূর্তি ধারণ করবে। এখানে উল্লেখ্যঃ কুরআনের ৮/৬৫ নম্বর আয়াত অনুযায়ী মু'মিন ও কাফেরের অনুপাত হলো ১ঃ১০ অর্থাৎ একজন মু'মিন দশজন কাফেরের সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম। এবার শুনুন, যে আয়াতটিতে লোক দেখানো বন্ধুত্বের কথা কুরআনে বলা হয়েছে।

"মু'মিনগণ যেন কখনো ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এইরূপ করিবে খোদার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না। অবশ্য তাহাদের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য বাহ্যতঃ এইরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করিলে তাহা আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন।" (৩/২৮)

পূর্বোক্ত অনুপাত অনুযায়ী দার-উল-হারাব ভারতের মু'মিনরা যদি হিন্দু-কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে থাকে, তবে তারা তাদের নিজস্ব পন্থা-পদ্ধতি মেনেই করেছে। তাদের দিক থেকে কোন অন্যায় কাজ করেনি। এখন কাফেরদের সিদ্ধান্ত নিতে হবেঃ তারা কি চিরকালই কাফের থাকবে, না কোনদিন মনুষ্যপদবাচ্য হবে?

(চ) রমজান মাসে স্ত্রীসহবাস হারাম ছিল——পরে হালাল করে দেয়া হয়েছে। কুরআনের ভাষায় শুনুন ঃ "রোজার সময় রাত্রিবেলা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত সংগম করা হালাল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পক্ষে পরিচ্ছদ স্বরূপ আর তোমরাও তাহাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানিতে পারিয়াছেন যে, তোমরা গোপনে গোপনে নিজেদের সহিত নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছ; কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ 'মাফ' করিয়া দিয়াছেন ও তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সহিত সহবাস কর এবং আল্লাহ্ যে স্বাদ গ্রহণ তোমাদের জন্য জায়েয করিয়া দিয়াছেন, তাহার আস্বাদন কর; আর রাত্রিবেলা খানাপিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সম্মুখে রাত্রির বুক হইতে প্রভাতের শেষ আভা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।" (২/১৮৭)

এই আয়াতটির বর্ণনাভঙ্গী অনুধাবন করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, এর বর্ণনাকারী আল্লাহ্র রসুল, আল্লাহ্ নিজে নন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা কখনই সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তাঁর রসুলের পক্ষেও স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্ অবশ্যই অহী অর্থাৎ আকার-ইঙ্গিতে তাঁর রসুলকে নিজের মনোভাব এবং সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন এবং রসুল তাঁর নিজের ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন মাত্র। এই আয়াতে আরও একটি ব্যাপার বেশ পরিস্কার যে, ঘটনাপ্রবাহের চাপে পড়ে স্বয়ং আল্লাহ্-ও নিজের সিদ্ধান্ত ও আদেশের পুনর্বিবেচনা করেন। অবশ্য আল্লাহ্র পক্ষে সবই সম্ভব।

(ছ) জুম'আর (শুক্রবারের) নামাজের গুরুত্ব। "হে সেই লোকেরা যাহারা

ঈমান আনিয়াছ, জুম'আর দিনে যখন নামাযের জন্য ঘোষণা দেওয়া হইবে, তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ কর। ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম যদি তোমরা জান।" (৬২/৯)

এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত। আল্লাহ্ সপ্তাহের শনিবার দিনটি ইহুদিদের জন্যে, রবিবারটি খৃষ্টানদের জন্যে এবং শুক্রবারটি মু'মিনদের অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে বিশেষ প্রার্থনার দিন ধার্য করেছেন। ইহুদি ও খৃষ্টানদের মতো মুসলমানরাও সম্মিলিত প্রার্থনায় (Congregation) বিশ্বাসী। ইসলামে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান আছে এবং তা আদায় দিতে হবে নিকটস্থ মসজিদে সমবেত হয়ে। এতে দু'টি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে—এক, নিজেদের মধ্যে সংহতি বজায় থাকবে; আর দুই, নিয়মিত প্রার্থনা করা হবে। যদি তারা প্রত্যহ মসজিদে সমবেত হয়ে নামাজ আদায় দিতে নাও পারেন, তবে সপ্তাহে অন্ততঃ একটি দিন অর্থাৎ তাদের নির্ধারিত শুক্রবার দিনটিতে যেন অবশ্যই সামিল হয়ে সম্মিলিত নামাজ আদায় দেন। নিজেদের মধ্যে সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের তরফ থেকে এই বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম।

(জ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়-নির্ধারণ ও পদ্ধতি। এ দু'টি ব্যাপারেও আল্লাহ্ বিশেষ বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফজরের নামাজের পর সাধারণতঃ মুজাহিদরা জিহাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাই যোহরের নামাজের সময় নির্ধারিত হয়েছে দিবা দ্বিপ্রহরের পর অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সূর্য যখন পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ে এবং মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘের সীমা অতিক্রম করে। ফজরের নামাজ ও যোহরের নামাজের মধ্যে সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানের কারণ একটাই হতে পারে বলে মনে হয়। সে-কারণটি হলো ঃ জিহাদ বা দিনের কর্মকাণ্ড আরম্ভ হওয়ার পর তা যাতে একটানা চলতে পারে এবং নামাজ আদারের কারণে সে-প্রক্রিয়া কোনভাবে ব্যাহত না হয়। পক্ষান্তরে লক্ষ্য করার বিষয়, এই একটানা কর্মকান্ডের পর যখন তাদের বিশ্রামের সময়, সেই সময় থেকে (আনুমানিক বেলা দুই ঘটিকা) রাতের অন্ধকার নেমে আসার মধ্যে বাকী চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় দেয়ার বিধান আছে। কারণ, এই সময়টা সাধারণতঃ তাদের বিশ্রামের সময়। এবং বিশ্রামের সময়ই নামাজ আদায় অর্থাৎ প্রার্থনার প্রকৃষ্ট সময়। তাই যোহরের নামাজ সহ আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ এবং এশার নামাজ আদায় দেয়ার বিধান। তবে এশার নামাজের ক্ষেত্রে এ-নিয়মের কিছু ব্যতীক্রম আছে। প্রয়োজনে সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে যে কোন সময় এশার নামাজ আদায় দেয়া যেতে পারে। মনে হয় এর-ও কারণ আছে। দিনের প্রথমার্ধের মতো, প্রয়োজনে রাতের প্রথমার্ধেও যদি মুজাহিদদের জিহাদে লিপ্ত হতে হয়, কিংবা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়, অথবা কোন জরুরী বৈষয়িক কাজে লিপ্ত হতে হয়, তখন যাতে এশার নামাজ সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে যে কোন সময় আদায় দেয়াতে কোন বাধা না থাকে তার জন্যেই এই বিধান দেয়া হয়েছে

বলে মনে হয়।

আবার নামাজের সময় অঙ্গসঞ্চালনের ব্যাপারেও আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্দের জন্যে বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা দিয়েছেন যাতে নামাজ পড়ার সাথে সাথে শরীরচর্চার কাজটিও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়। দুর্বল অথবা অগঠিত শরীর নিয়ে তো আর জিহাদে সামিল হওয়া যায় না। অথচ ইসলামী মতে জিহাদে সামিল হওয়া একটি ব্যধ্যতামূলক কাজ। তারা যাতে নিজেদের জিহাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন তার জন্যে আল্লাহ্ বিশেষ সচেতন এবং যত্নবান ছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই, নামাজ পড়ার সময় প্রথমে তারা সামরিক কায়দায় সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান হন এবং নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে-ভাবে তারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে আল্লাহ্র নিকট দোয়া প্রার্থনা ও সীজদা করেন তাতে প্রার্থনার সাথে সাথে যুগপৎ শরীরচর্চার কাজটিও নিষ্পন্ন হয়। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সাথে সাথে শরীর সুস্থ রাখার জন্যে যদি পাঁচবার শরীরচর্চার কাজও একসঙ্গে সেড়ে ফেলা যায় তবে শরীর তো সুস্থ থাকেই, একই সঙ্গে সময়েরও সদ্ব্যবহার হয়।

(ঝ) কাফের-নিধনে মু'মিনদের মানসিক প্রস্তুতি।

জিহাদের পথে কাফের-নিধনে মু'মিনদের হৃদয় যাতে কঠিন-কঠোর থাকে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে এতটুকুও অনুকম্পার উদ্রেক না হয়, তার জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। যে-সব পশু খাদ্যের জন্যে হালাল এবং যে-সব পশু কুরবানীর জন্যে বিধিসম্মত, তাদেরকে নিশ্চয়ই হত্যা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? তাদেরকে একবারে হত্যা না করে যবেহ্ পদ্ধতিতে হত্যা করা ইসলামের বিধান। মনে হয়, পশু যবেহ্ করার পর তাদের দেহ থেকে যে-ভাবে রক্তক্ষরণ হয় এবং যে-ভাবে তারা যন্ত্রণায় ছটফট করে তা দেখে যাতে মু'মিনদের হৃদয়ে এতটুকু করুণার সৃষ্টি না হয় এবং এতে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় তার জন্যেই এত ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ, অপরাধের গুরুত্ব বুঝে অপরাধীকে যে-ভাবে শাস্তি দেয়ার বিধান ইসলাম দিয়েছে তা শুধু বেদনাদায়কই নয়, চরম নিষ্ঠুরতার-ও পরিচায়ক। যেমন চুরি করলে হাত কেটে ফেলা, হত্যা বা ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম পাথর চুড়ে ক্ষত-বিক্ষত করা কিংবা আমৃত্যু পানাহার বন্ধ করে দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখা ইত্যাদি। এরূপ নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি-দানের ফলে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি এবং নরহত্যা কিংবা ব্যাভিচার কতখানি হ্রাস পেয়েছে কিংবা আদৌ হ্রাস পায়নি তা অন্য কথা। সে-কথায় যাবো না। তবে দিনের পর দিন নির্মমভাবে পশুহত্যা এবং অপরাধের জন্যে নিষ্ঠুরভাবে শাস্তিদান প্রত্যক্ষ করার ফলে মু'মিনদের হৃদয়ের সুকোমল প্রবৃত্তি ও অনুভূতিগুলি যে ক্রমান্বয়ে প্রস্তর-খণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আমরা দেখতে পাই, এই কঠিন কঠোর হৃদয়-মন নিয়ে মু'মিনরা যখন জিহাদে লিপ্ত হয় তখন নরহত্যা তো বটেই, নারীহত্যা, শিশুহত্যায় তাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অনুকম্পার সৃষ্টি হয় না। এবং এ সব কিছুই অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র ইসলামের নামে এবং

পবিত্র ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার নামে।

(ঞ) রোজ কেয়ামতে আমলনামার গুরুত্ব। আল্লাহ্কে ফাঁকি দেয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি মানব-সন্তান প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যে-সব কাজ করে যাচ্ছে আল্লাহ্র ফেরেস্তাগণ তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একটি বিরাট খাতায় লিখে রাখছেন। রোজ কেয়ামতে (শেষ বিচারের দিন) আল্লাহ্ যখন তাঁর শিংগায় ফুঁক দেবেন তখন সব বিশ্বাসী (আল্লাহ্ ও তাঁর কুরআনে যারা বিশ্বাসী) এবং অবিশ্বাসীরা নিজ নিজ কবর থেকে উঠে তাঁর দরবারে যেয়ে হাজির হবে। তখন আল্লাহ্র ফেরেস্তারা তাদের প্রত্যেকের হাতে কর্মানুযায়ী (ভাল এবং মন্দ) একখানা করে আমলনামা ধরিয়ে দেবেন এবং তদনুযায়ী কাউকে জান্নাতের দিকে যেতে বলবেন, আবার কাউকে জাহান্নামের দিকে পাঠিয়ে তার দাউ-দাউ-করা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন।

(ট) কুরআনে পাশাপাশি শাস্তি ও পুরস্কারের সতর্কবাণী ঃ আল্লাহ্র-তরফ থেকে আর একটি প্রথম শ্রেণীর কূটনীতি।

সাধারণ মানুষকে ইসলামে আকৃষ্ট করার জন্যে যে-সব পন্থা-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে তাদের মনে যুগপৎ ভীতি ও প্রলোভনের সঞ্চার করা অন্যতম। এবং সে-কাজ করতে যেয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কুরআনের বহু সুরায় পাশাপাশি দু'টি চিত্র বেশ পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁরা তাঁদের কূটনীতির চরম স্বাক্ষর রেখেছেন। একদিকে পুরস্কার, অপরদিকে কঠোর শাস্তি। অজ্ঞ-মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেদিনের সাধারণ মানুষ কোন্টি বেছে নেবে বা গ্রহণ করবে? নমুনা স্বরূপ পাশপাশি এরূপ দু'টি আয়াত তুলে দিচ্ছি ঃ

"যে-সব লোক আমার আয়াত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করিব। যখন তাহাদের দেহের চামড়া গলিয়া যাইবে তখন তদ্স্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিয়া দিব, যেন তাহারা আযাবের স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকরী করার পন্থা-কৌশল খুব ভাল করিয়াই জানেন।" (৪/৫৬)

ঠিক পরের আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন ঃ "আর যাহারা আমার আয়াত মানিয়া লইয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে আমরা এমন বাগিচায় প্রবেশ করাইব, যাহার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকিবে। সেখানে তাহারা চিরদিন থাকিবে; সেখানে পবিত্রা স্ত্রী পাইবে এবং তাহাদিগকে আমি ঘন ছায়ার আশ্রয় দান করিব।" (৪/৫৭)

পাঠকের অবগতির জন্যে এরূপ বিপরীত-মুখী কিছু আয়াতের নম্বর তুলে দিচ্ছি। উৎসুক পাঠক ইচ্ছে করলে পড়ে দেখতে পারেন। ১) ৪/৫৬=৪/৫৭; ২) ৩০/১৫=৩০/১৬; ৩) ৪৪/৪৩-৫০=৪৪/৫১-৫৭; ৪) ৫২/১১-১৬=৫২/১৭-২৪; ৫) ৬৭/৬-১১=৬৭/১২; ৬) ৬৯/১৯-২৪=৬৯/২৫-৩৭; ৭) ৭৬/৪=৭৬/৫-২২; ৮) ৯৮/৬=৯৮/৭-৮; ইত্যাদি

২৩। খোদার কুদরতের কিছু নমুনা

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে খোদার কুদরতের বর্ণনা করা হয়েছে। সে-সব বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই ঃ 'তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সব জানেন, তাঁর কাছ থেকে কেউ কিছু লুকোতে পারে না, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন' ইত্যাদি। আমাদের মতে, পূর্বোক্ত যে-সব গুণাবলী বা ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা জানাবার জন্যে, তারপর নতুন করে আর কোন বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। তবুও যখন কুরআন খোদার কুদরতের বিবরণ ভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই আমরাও সে-সব বিবরণ থেকে কিছু আয়াত তুলে দিলাম যাতে কাফেররা বুঝতে পারে, "কেননা উহারা এমন লোক, যাহারা জ্ঞান রাখে না।" (৮/৬৫)

(ক) "তাঁহার দিনর্শনাদির মধ্যে একটি হইল এই যে, তিনি বাতাস পাঠাইয়া দেন সুসংবাদ দানের জন্য এবং তোমাদিগকে নিজের রহমত দানে ধন্য করিবার জন্য। আর এজন্য যে, নৌকাগুলি তাঁহার হুকুমে চলিবে এবং তোমরা তাঁহার অনুগ্রহের সন্ধান করিবে ও তাঁহার শোকর আদায় করিবে।" (৩০/৪৬)

(খ) "আল্লাহ্-ই বাতাস পাঠাইয়া থাকেন এবং উহা মেঘমালাকে উত্থিত করে। পরে উহা মেঘমালাকে আকাশে ছড়াইয়া দেয় যেমন চায় এবং উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেয়। পরে তুমি দেখিতে পাও যে, বৃষ্টির ফোঁটা মেঘমালা হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়িতে থাকে। তিনি তাঁহার বান্দাহ্‌দের মধ্য হইতে যাহার উপর যখন চাহেন বর্ষাইয়া থাকেন, তখন সহসা তাহারা আনন্দে বিগলিত হইয়া ওঠে; (৩০/৪৮)

"অথচ উহার বর্ষণের পূর্বে তাহারা নিরাশ হইয়া যাইতেছিল। (৩০/৪৯)

"আল্লাহ্‌র এ রহমতের প্রভাব লক্ষ্য কর, মরিয়া পড়িয়া থাকা যমীনকে তিনি কিভাবে জীবন্ত করিয়া তোলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবনদান-কারী এবং তিনি সর্ববিষয়ে সক্ষম।" (৩০/৫০)

(গ) "তিনি আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন কোনরূপ স্তম্ভ ব্যতীতই, যাহা তোমরা দেখিতে পার। তিনি যমীনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন, যেন উহা তোমাদেরকে লইয়া হেলিয়া না যায়। তিনি সব রকমের জীব-জন্তু যমীনের বুকে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন, আসমান হইতে পানি বর্ষাইয়াছেন এবং যমীনের বুকে রকমারী উত্তম জিনিষ-সমূহ উৎপাদন করিয়াছেন।" (৩১/১০)

(ঘ) "তিনি আল্লাহ্-ই যিনি আকাশমণ্ডল ও যমীন এবং এই দুইয়ের মধ্যে যত জিনিসই আছে, ছয়দিনের মধ্যে পয়দা করিয়াছেন এবং উহার পর আরশের (আল্লাহ্‌র বসার সিংহাসনের নাম) উপর আসীন হইয়াছেন।...... (৩২/৪)

'তিনিই আসমান হইতে যমীন পর্যন্ত সব কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন এবং এই ব্যবস্থাপনার বিবরণ উর্দ্ধে তাঁহার সমীপে এমন একদিনে উপস্থিত হয় যাহার পরিমান

তোমাদের গণনার এক হাজার বছর।" (৩২/৫)

(ঙ) "এই লোকেরা কি (ইতিহাসের এইসব ঘটনার) কোন হেদায়াত পাইল না যে, তাহাদের পূর্বে কত জাতিকেই না আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদের বসবাসের স্থান-সমূহের উপর দিয়া এখন তাহারা চলাফেরা করিতেছে? মূলতঃ ইহাতে তো অনেক বড় বড় নিদর্শন রহিয়াছে।—ইহারা কি শুনিতে পায় না? (৩২/২৬)

"—ইহারা কি এই দৃশ্য কখনো দেখে নাই যে, আমরা এক তৃণপানি বিহীন যমীনের দিকে পানি প্রবাহিত করি এবং পরে সেই যমীনেই এমন ফসল ফলাই যাহা হইতে তাহাদের জন্তু-জানোয়ারও খাদ্য লাভ করে, আর তাহারাও খাবার পাইয়া থাকে? তাহা হইলে ইহারা কি কিছুই বুঝিতে পারে না?" (৩২/২৭)

(চ) "হে ঈমানদারগণ, স্মরণ কর খোদার অনুগ্রহ, যাহা তিনি (এইমাত্র) তোমাদের প্রতি দেখাইয়াছেন ঃ যখন শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হইয়া আসিয়াছিল তখন আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল ঝটিকা পাঠাইয়াছিলাম এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলাম যাহা তোমাদের গোচরীভূত হইত না। আল্লাহ্ সব কিছুই দেখিতেছিলেন যাহা তোমরা তখন করিতেছিলে।" (৩৩/৯)

(ছ) "তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন পরে উহার সাহায্যে আমরা রকম-বেরকমের ফল বাহির করিয়া আনি, যেগুলির বর্ণ বিভিন্ন? পাহাড়েও সাদা, লাল ও গাঢ় কালো রেখা পাওয়া যায়, যেগুলির রংও নানপ্রকারের। (২২/২৭)

"এমনিভাবে মানুষ, জন্তুজানোয়ার ও গৃহপালিত পশুগুলির বর্ণও হয় বিভিন্ন প্রকারের। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাহ্দের মধ্যে কেবল ইল্ম-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁহাকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী।" (২২/২৮)

(জ) "তিনি, যিনি তোমাদের জন্য শ্যামলসমুজ গাছ হইতে আগুন সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা ইহা দ্বারা নিজেদের চুলা ধরাও। (৩৬/৮০)

"যিনি আকাশসমুহ ও যমীন পয়দা করিয়াছেন, তিনি কি উহাদের মত আবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। (৩৬/৮১)

"তিনি যখন কোন জিনিষের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে হুকুম করিবেন যে, হইয়া যাও, আর অমনি তাহা হইয়া যায়।" (৩৬/৮২)

(ঝ) "আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যে রহিয়াছে এই রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করিও না। সিজদা কর সেই খোদাকে যিনি এইগুলিকে পয়দা করিয়াছেন, যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁহারই ইবাদতকারী হইয়া থাক। (৪১/৩৭)

"কিন্তু এই লোকেরা যদি অহঙ্কারে নিমগ্ন হইয়া নিজেদেরই কথার উপর জিদ ধরিয়া থাকে তাহা হইলে সেইজন্য কোন পরোয়া নাই। যেসব ফেরেশতা তোমার খোদার নিকটবর্তী তাহারা দিনরাত তাঁহার তস্বীহ করে এবং কখনই ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। (৪১/৩৮)

(সিজদা)।

"আর আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যে একটি এই যে, তুমি দেখিতে পাইতেছ, যমীন শুষ্ক জীর্ণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পরে যখনই আমরা উহার উপর পাণি বর্ষণ করিলাম। সহসা উহা উথলিয়া উঠে, স্ফীত হয়। যে খোদা এই মরা যমীনকে জীবন্ত করিয়া দেন, তিনি মৃত লোকদিগকেও নিঃসন্দেহে জীবনদান করিবেন। (৪১/৩৯)

"শীঘ্রই আমরা ইহাদিগকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দিকচক্রবালে দেখাইব এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও, যেন তাহাদের সামনে এই কথা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, এই কুরআন বাস্তবিকই সত্য। এই কথা কি যথেষ্ট নহে যে, তোমার খোদা সব কিছুরই সাক্ষী।" (৪১/৫৩)

(ঞ) "তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হইতেছে এই জাহাজ, যাহা সমুদ্রে পাহাড়ের মত দেখা যায়। (৪২/৩২) "আল্লাহ্ যখন চাহিবেন বাতাস থামাইয়া দিবেন এবং ইহা সমুদ্রের বুকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে—ইহাতে বড় নিদর্শন রহিয়াছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যশীল ও শোকর আদায়কারী। (৪২/৩৩) "কিংবা (উহার আরোহীদের) অনেক গুনাহ্‌কে মাফ করিয়া দিয়াও তাহাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিবেন, (৪২/৩৪) "এবং তখন আমাদের আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ককারী লোকেরা জানিতে পারিবে যে, তাহাদের জন্য আশ্রয় কিছুই নাই।" (৪২/৩৫)

(ট) "আল্লাহ্ যমীন ও আকাশমণ্ডলের বাদশাহীর মালিক। তিনি যাহাই চাহেন সৃষ্টি করেন, যাহাকে চাহেন কন্যা-সন্তান দেন যাহাকে চাহেন পুত্র সন্তান দেন। (৪২/৪৯)

"যাহাকে চাহেন পুত্র কন্যা উভয় রকমেরই সন্তান দেন। আর যাহাকে চাহেন বন্ধ্যা করিয়া দেন। তিনি সব কিছুই জানেন এবং সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (৪২/৫০)

(ঠ) "কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত সামনা-সামনি কথা বলিবেন। তাঁহার কথা হয় অহী (ইশারা) রূপে হইয়া থাকে; কিংবা পর্দার পিছন হইতে অথবা তিনি কোন পয়গামবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁহার নির্দেশে যাহা কিছু তিনি চাহেন অহী করে। তিনি মহান সুবিজ্ঞানী।" (৪২/৫১)

(ড) "আকাশমণ্ডল আমরা নিজের শক্তিবলে সৃষ্টি করিয়াছি। আর আমরাই ইহার শক্তি রাখি। (৫১/৪৭) "ভূ-পৃষ্ঠকে আমরাই বিস্তীর্ণ করিয়া বিছাইয়াছি। আর আমরা অতীব ভাল সমতল রচনাকারী। (৫১/৪৮) "আর প্রত্যেকটা জিনিসেরই আমরা জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি।— সম্ভবতঃ তোমরা ইহা হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিবে। (৫১/৪৯) "অতএব দৌড়াও আল্লাহ্‌র দিকে। আমি তোমাদের জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (৫১/৫০)

(ঢ) "এই লোকেরা কি নিজেদের উপর উড়ন্ত পাখীগুলিকে পক্ষ বিস্তার করিতে ও গুটাইয়া লইতে দেখে না? মহান রহমান ছাড়া উহাদিগকে অন্য কেহ ধরিয়া রাখে না। তিনিই সব জিনিসের সংরক্ষক।' (৬৭/১৯)

(ণ) "ইহা কি সত্য নয় যে, আমরাই যমীনকে শয্যা বানাইয়াছি" (৭৮/৬)। "পাহাড়-পর্বতসমূহকে গ্রাফীর ন্যায় গাড়িয়া দিয়াছি। (৭৮/৭)। "এবং তোমাদিগকে (নারী-পুরুষের) জোড়ারূপে পয়দা করিয়াছি; (৭৮/৮)। "তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন করিয়াছি? (৭৮/৯)। "রাত্রিকে আচ্ছাদনকারী ও দিনকে জীবিকার্জনের সময় বানাইয়া দিয়াছি; (৭৮/১০-১১)। "তোমাদের উপর সাতটি সুদৃঢ় আকাশ-মণ্ডল সংস্থাপিত করিয়াছি (৭৮/১২)। "এবং এক অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত দীপ বানাইয়াছি; (৭৮/১৩)। "মেঘমালা হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি বর্ষাইয়াছি (৭৮/১৪)। "এই উদ্দেশ্যে যে, উহার সাহায্যে শস্য, শাক-শব্জী ও ঘন সন্নিবদ্ধ বাগ-বাগিচা উদ্ভাবন করিব?" (৭৮/১৫-১৬)।

এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের যে সব আয়াতে বহুবচনে "আমরা" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সে-সব আয়াতের বর্ণনাকারীকে যদি কোন নিরপেক্ষ পাঠক একক সত্তা হিসেবে মনে না করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলকে যুগ্ম-সত্তা হিসেবে মনে করেন, তবে কি তিনি ভুল করবেন?

এই অবসরে আমি আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন রাখতে চাই। যে-সত্তার শক্তি-সামর্থ্যের কোনই সীমা-পরিসীমা নেই, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি মৃতজমিতে বারি-বর্ষণ করে ফসল ফলাতে পারেন, যিনি মৃতব্যক্তিকে পুণর্জীবিত করতে পারেন, কেন তবে তিনি আরবের মরুপ্রান্তে বসবাসকারী তাঁর একান্ত অনুগত বান্দাহ্দের প্রতি একটু কৃপা করলেন না, কৃপাপরবশ হয়ে তাদের জাগতিক জীবনে কেন একটু সুখশান্তির ব্যবস্থা না করে জিহাদ ও মালে গণীমতের দিকে ঠেলে দিলেন এবং অনন্ত জীবন-যৌবন ও সীমাহীন ভোগ্যপণ্য মৃত্যুর পর জান্নাত-জীবনের জন্যে তুলে রাখলেন?

২৪। মোল্লা ও মৌলবীদের নিকট কিছু প্রশ্ন

কুরআনের কিছু আয়াত এবং কিছু ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে, যার সঠিক উত্তর বর্তমান লেখকের নিকট পরিস্কার নয়। তাই ইসলামি পণ্ডিতদের নিকট সে-সব আয়াত এবং ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে ঃ

(ক) যেখানে কুরআনে অসংখ্যবার বর্ণিত হয়েছে যে, এটি হলো আল্লাহ্-প্রদত্ত আসমানী কিতাব, সেখানে আল্লাহ্র রসুলের মনে, এর সত্যতা নিয়ে, কীভাবে সন্দেহের বাসা বাঁধা সম্ভব? এবং তার জন্যে স্বয়ং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরই রসুল হজরত মুহাম্মদকে সাবধান এবং তিরস্কার করা কতখানি স্বাভাবিক? শুনুন তবে।

'ইহা একখানি কিতাব, ইহা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অতএব হে মুহাম্মদ! তোমার 'দিলে' ইহার জন্য যেন কোনরূপ কুণ্ঠা না জাগে। ইহা নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহার দ্বারা তুমি (অমান্যকারীদের) ভয় দেখাইবে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য ইহা হইবে স্মরণ ও স্মারক।" (৭/২)

"এখন যদি তোমার প্রতি নাযিল করা হেদায়াত সম্পর্কে তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যাহারা পূর্ব হইতে কিতাব পাঠ করিতেছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে প্রকৃত সত্যই তোমার নিকট আসিয়াছে তোমার খোদার নিকট হইতে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।" (১০/৯৪)

"আর তাহাদের মধ্যে তুমি সামিল হইও না, যাহারা আল্লাহ্‌তা'আলার আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করিয়াছে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে একজন হইবে।" (১০/৯৫)

"ইহা সেই জ্ঞানপূর্ণ কথা যাহা তোমার খোদা তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল করিয়াছেন। আর লক্ষ্য কর, আল্লাহ্‌র সহিত অপর কোন মা'বুদ বানাইয়া বসিও না। অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে—তিরস্কৃত ও সব কল্যান হইতে বঞ্চিত অবস্থায়।" (১৭/৩৯)

"হে নবী! সেই খোদার উপর ভরসা রাখ, যিনি চিরঞ্জীব, কখনই মরিবেন না।..." (২৫/৫৮)

"অতএব হে নবী! আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখো; নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (২৭/৭৯)

(খ) পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, মুসলমানরা সাধারণতঃ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে মাদ্রাসা-মক্তবে প্রেরণ করেন, যেখানে প্রথাগত (conventional) শিক্ষার চেয়ে ইসলামী শিক্ষার উপর বেশি জোর এবং গুরুত্ব দেয়া হয়। ফল দাঁড়াচ্ছে এই, ক্রমান্বয়ে তারা আধুনিক শিক্ষার জগৎ থেকে নিজেরা সরে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার দরুন সর্বদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। তারা কি মনে করেন (আমি এখানে মোল্লা-মৌলবীদের কথা বলছি), যে-মূহুর্তে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে, সে-মুহূর্ত থেকে আল্লাহ্-প্রদত্ত আইনকানুন, বিধি-বিধানের প্রতি তাদের বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে আসতে থাকবে এবং অনতিবিলম্বেই এমন একটি দিন আসবে যেদিন তারা এ-সবের প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠবে? তাই যদি না হবে, তবে দিন দিন মাদ্রাসা-মক্তবের সংখ্যা বেড়ে না যেয়ে সাধারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতো এবং মুসলমান ছেলেমেয়েদের বেশি সংখ্যায় সে-সব বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো। যেহেতু তা হচ্ছে না, তাই পূর্বোক্ত প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

(গ) বিশ্ববাসীকে জানানো হয়েছে, কুরআনে যে-সব আয়াত লিপিবদ্ধ করা আছে তার সব ক'টিই আল্লাহ্-প্রদত্ত। তাই যদি হবে, তবে কুরআনের একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, কীভাবে এই আয়াতটি কুরআনে স্থান পেলো, যেখানে বলা হয়েছে, "....কুরআনে এই যে-সব কথা বলা হইতেছে, ইহা মনগড়া বা কৃত্রিম কথাবার্তা নহে।....." (১২/১১১)। কুরআনে বর্ণিত সব আয়াতই (From A to Z) যেখানে আল্লাহ্-প্রদত্ত, সেখানে বিশেষ করে 'ইহা মনগড়া বা কৃত্রিম কথাবার্তা নহে' বলার তাৎপর্য কী?

(ঘ) সুরা আহ্যাবের (৩৩/৬) আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই নবী তো ঈমানদার লোকদের পক্ষে তাহাদের নিজেদের অপেক্ষাও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এবং নবীর স্ত্রীগণ উহাদের মা; ...." আবার একই সুরার ৫৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

"..........তোমরা আল্লাহ্র রসুলকে কষ্ট দিবে, তাহা তোমাদের পক্ষে কিছুতেই জায়েয হইতে পারে না, না তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে জায়েয হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা খোদার নিকট অতি বড় গুণাহ্।" আমাদের মতে, ৬ নম্বর আয়াতের পর ৫৩ নম্বর আয়াতে সাবধানবাণী উচ্চারণের কোনই প্রাসঙ্গিকতা নেই যদি আল্লাহ্র বান্দাহ্রা সত্যিকারের ঈমানদার হয়ে থাকেন। এ-প্রসঙ্গে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা কী?

(ঙ) "যে কেহ পরকালীন ফসল চাহে, তাহার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পাইতে চাহে, তাহাকে দুনিয়া হইতেই দান করি; কিন্তু পরকালে তাহার কিছুই প্রাপ্য হইবে না।" (৪২/২০)। খুব ভাল কথা। যে-ব্যক্তির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নিশ্চিতরূপেই তিনি একজন বিশ্বাসী এবং ঈমানদার, নতুবা ইহজগতেও পুরস্কৃত করা হতো না। কারণ, বিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকেই ইহ্কাল কিংবা পরকালে ইসলাম পুরস্কৃত করে না। ইহ্কালে তো বিশ্বাসী তার পাওনা-গণ্ডা বুঝে পেলেন বা নিলেন, পরকালে তার জন্য কিছুই পাওনা রইলো না। এব্যাপারেও আমাদের কিছু বলার নেই। তবু-ও একটি প্রশ্ন থেকে যায় ঃ রোজ কেয়ামতে তার স্থান হবে কোথায়? পৃথিবী তো তখন ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে শুধু বিশ্বাসীদের জন্যে জান্নাত, আর কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম। এমতাবস্থায় আলোচ্য বিশ্বাসী বান্দাহ্টি চিরদিন কোথায় থাকবেন এবং খাবেনই বা কী?

(চ) "যাহারা নিজেদের অ-দেখা খোদাকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফল।" (৬৭/১২)। আমরা জানি, খোদাকে কেউ দেখতে পায় না; তিনি সব সময়ই অন্তরালে থেকে তাঁর কাজ করে যান বা যাচ্ছেন আবহমান কাল ধরে। সুতরাং নতুন করে এই আয়াতটিতে 'অ-দেখা খোদার' প্রসঙ্গের অবতারণা করার তাৎপর্য বুঝা গেলো না। তবে কি তাঁর 'দেখা-রূপও' আছে? যদি থাকে তবে সে-রূপটি কী এবং কেমন? না কি বিশ্বাসীদের মনে ভীতির সঞ্চার করে আল্লাহ্র প্রতি তাদের বিশ্বাস যাতে আরও গাঢ় হয় এবং বৃদ্ধি পায় তার জন্যে এই আয়াত নাযিল হয়েছে?

(ছ) আবার মূর্তিপূজা প্রসঙ্গে আসতে হলো। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্ সূর্য সহ চাঁদ ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ঃ কাফেরদের সূর্যনমস্কার ও বন্দনা মু'মিনদের নিকট গুণাহ্, পক্ষান্তরে মু'মিনদের চাঁদ-তারার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন ফরজ। এ-ব্যাপারটা বর্তমান লেখকের নিকট বেশ গোলমেলে ঠেকছে। কেউ যদি বুঝিয়ে দেন, কৃতজ্ঞ থাকবো। দ্বিতীয়তঃ কাফেরদের 'শালগ্রাম শিলা' এবং মক্কার কাবাগৃহে রক্ষিত 'হাজরে আসওয়াদ' উভয়ই পবিত্র প্রস্তর খণ্ড। 'শালগ্রাম শিলা'-র পূজা পৌত্তলিকতা এবং অংশীদারী,

পক্ষান্তরে 'হাজরে আসওয়াদ'-এর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন ফরজ। এ ব্যাপারটাও পরিস্কার হওয়া দরকার। তৃতীয়তঃ কাফেরদের মূর্তিপূজার অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদারীত্ব করা, অতএব গুণাহ্; পক্ষান্তরে বিশিষ্ট মুসলমান ব্যক্তিদের 'মাজারে' চাদর বিছানো এবং ধূপ-বাতি দান মূর্তিপূজার অন্তর্গত নয়, বরং ফরজ। এ-ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা-ই বা কী?

(জ) ইসলামে পর্দাপ্রথার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর সেই পর্দা-প্রথা অমান্য করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের শ্রীমতি বেনাজীর ভুট্টো, ভারতের সর্ব-শ্রীমতি নাজমা হেপতুল্লা ও মহসিনা কিদোয়াই এবং বাংলাদেশের সর্ব-শ্রীমতি হাসিনা ওয়াজেদ ও খালেদা জিয়া মুসলীম উন্মতে নিন্দিত হচ্ছেন না কেন? কেন-ই বা কোন ফতোয়ার সম্মুখীন হচ্ছেন না? তাঁরা কি খাঁটি মুসলমান নন?

(ঝ) সাধারণ ব্রহ্মবাদীদের কথা বাদ-ই দেয়া যাক। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূর্তিপূজক নন—জন্মসূত্রে এবং বিশ্বাসে তিনি একজন খাঁটি ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ একেশ্বরবাদী। ইসলামী মতে, আমাদের প্রশ্ন, তিনি কি কাফের, না মু'মিন?

(ঞ) কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে যা কিছু করতে পারেন এবং 'হয়ে যাও' বল্লেই বা ভাবলেই তা হয়ে যায়। সুতরাং এই সূত্র ধরে আমরা যদি আল্লাহ্‌র নিকট জানতে চাই, কেন তিনি যে-কোন মুহূর্তে পৃথিবীর সব মানব-সন্তানকে ইসলামী দাওয়াতে সামিল করছেন না, তাহলে কি বে-আদবী হবে?

ধরেও যদি নিই, লোকশিক্ষার জন্যে আল্লাহ্ তা করছেন না, তবু-ও একটা প্রশ্ন থেকে যায় ঃ লোকশিক্ষার নামে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ কাফের ও মু'মিনদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করেছেন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এবং আজো যা চলছে অব্যাহত গতিতে তাতে কি মেহেরবান খোদার মানমর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে, না বৃদ্ধি পাচ্ছে?

(ট) প্রসঙ্গতঃ একটি প্রশ্ন মনে আসছে। ধরে নেয়া যাক, কোনও এক রাত্রি-শেষে অর্থাৎ রাত ভোর হওয়ার সাথে সাথে এক অজ্ঞাত কারণে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলো—পৃথিবীতে অমুসলমান বলে আর কেউ রইলো না। সেক্ষেত্রে সারা জাহানের সাহানসাহ্ কে হবেন? তা নিয়ে কি কোনপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেবে না? বর্তমান বিশ্বে ইসলামি দেশসমূহে মালপানির অধিকার নিয়ে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে (যে-সংগ্রাম ইসলামী ও অন-ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে নয়) সেদিন কি একইভাবে সে-সংগ্রাম চলবে না বা চলতে থাকবে না?

(ঠ) পরিশেষে বলছি ঃ ধরে নেয়া যাক, এ-সংগ্রাম বা সমস্যাও একসময় একটা কাজ-চলা-গোছের সমাধানে উপনীত হওয়া গেলো, তখন হারেমের জন্যে একাধিক নারী পাওয়া যাবে কোথা থেকে? সবাই তো তখন মুসলমান হয়ে গেছে। সেই সুবাদে তাদের প্রত্যেকেরই অধিকার জন্মেছে (সরিয়তী আইন অনুযায়ী) চার চারটি পর্যন্ত নারীকে একসংগে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই (অদ্যাবধি যা ঘটে চলেছে) নারী-

পুরুষের আনুপাতিক হার মোটামুটি সমান সমান, অথবা এই হার শতকরা ৯৬ থেকে ১০৪-এর মধ্যে ওঠানামা ঘটাচ্ছেন—কোনক্রমেই এই আনুপাতিক হার ১ঃ২ কিংবা ১ঃ৩ বা ১ঃ৪ করেননি। এমতাবস্থায় বহুবিবাহের (Polygamy) সমস্যাটা আল্লাহ্‌তা'আলা কীভাবে মেটাবেন? না কি তখন আল্লাহ্ পুরুষ-নারীর আনুপাতিক সংখ্যা ১ঃ৪ বা তারও অধিক করার সিদ্ধান্ত নেবেন এবং তদনুযায়ীই নারী-পুরুষ সৃষ্টি করবেন?

২৫। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদ কি অভিন্ন সত্তা?

এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মুহাম্মদুর রসুলুল্লা"-র মধ্যে (অর্থাৎ আল্লাহ্-ই একমাত্র উপাস্য, হজরত মুহাম্মদ তাঁর রসুল)। এখানে মনে করলে ভুল হবে না, যেহেতু হজরত মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল অর্থাৎ প্রতিনিধি, তাই তিনিও উপাস্য। এরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই কুরআনের অসংখ্য আয়াতে। কুরআন পাঠকের নিকট এ-ঘটনা অবিদিত নয়। তাই নমুনাস্বরূপ আমরা তা থেকে মাত্র দু'চারটি উল্লেখ করবো।

(ক) "হে নবী! লোকদের বলিয়া দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই খোদার প্রতি ভালবাসা পোষণ কর তবে আমার অনুসরণ কর; তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুণাহ্ মা'ফ করিয়া দিবেন।......" (৩/৩১)

(খ) "তাহাদের বল, আল্লাহ্ এবং রসুলের আনুগত্য কবুল কর। অতঃপর তাহারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে আল্লাহ্ সেই সব লোকদিগকে —যাহারা তাঁহার ও তাঁহার রসুলের আনুগত্য করিতে অস্বীকার করে কিছুতেই ভালবাসিতে পারেন না।" (৩/৩২)

(গ) "হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, এবং আদেশ শুনিবার পর তাহা অমান্য করিও না।" (৮/২০)

(ঘ) "হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ডাকে সাড়া দাও।...." (৮/২৪)

অতঃপর কুরআন পাঠকালে এমন কিছু আয়াতের মুখোমুখী হয়েছি যা পাঠ করে আমার মনে আরও একটি প্রশ্ন জেগেছে ঃ হজরত মুহাম্মদ কি সব সময় আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন এবং তদনুযায়ী কাজ করতেন, না কি বহুক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাঁর রসুলের মনোভাব পূর্বাহ্নে অবগত হয়ে বা জানতে পেরে তদনুযায়ীই নির্দেশ দিতেন? এ প্রশ্নের উত্তর-ও আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমাকে আবার সেই কুরআনে নাযিল হওয়া আয়াতসমুহের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এরূপ যতো আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকে মাত্র একটি আয়াত (২/১৪৪) উদ্ধৃত করবো। আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়েছিল 'কেবলা' পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে। একটু পরেই আয়াতটির সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটবে। আশা করা যায়, তখন পাঠক নিজেই এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন।

'কেবলা' পরিবর্তন ঃ ইসলামে প্রথম 'কেবলা' (অর্থাৎ যেদিকে মুখ করে প্রার্থনা

করতে হবে) নির্ধারিত হয় জেরুজালেমের বায়েত-উল-মুকাদ্দাস। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখা গেলো, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এর প্রবর্তন করা হয়েছিল সে-উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে না তখন 'কেবলা' পরিবর্তনের প্রয়োজন হলো। এই পরিবর্তন নিয়ে নানাজনে নানাকথা বলতে শুরু করেছিল। তখন আল্লাহ্ নাযিল করলেন ঃ "নির্বোধ লোকেরা অবশ্যই বলিবে ঃ ইহাদের কি হইয়াছে, প্রথমে যে কেবলার দিকে মুখ করিয়া ইহারা নামায পড়িত, তাহা হইতে সহসা কেন ফিরিয়া গেল? হে নবী! ইহাদের বলিয়া দাও— 'পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন সহজ-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।" (২/১৪২)। অতঃপর আল্লাহ্ এর কারণ বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, "....পূর্বে তোমরা যেদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে, উহাকে আমরা শুধু এইজন্য কেবলারূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম যে, কে রসুলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরিয়া যায়, তাহাই আমরা দেখিতে ও জানিতে চাহিয়াছিলাম।....." (২/১৪৩)

এ-পর্যন্ত সব ঠিক-ঠাকই চলছিল, মনে কোনই প্রশ্ন দেখা দেয়নি; কারণ, আল্লাহ্ যা ভাল মনে করেছেন সেরূপই আয়াত নাযিল করেছেন। সবই আল্লাহ্‌র ব্যাপার, তাতে কার কি বলার আছে? কিন্তু পরবর্তী আয়াতটি(২/১৪৪) পাঠ করার পর মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক ঃ কেবলা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি কি তিনি নিজে নিয়েছিলেন, না কি তাঁর রসুলের ইচ্ছা পূরণের জন্যেই নিয়েছিলেন? আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

"তোমার বারবার আকাশের দিকে ফিরিয়া তাকানোকে আমরা দেখিতে পাইতেছি; এখন তোমার মুখ আমরা সেই কেবলার দিকেই ফিরাইয়া দিতেছি, যাহা তুমি পছন্দ কর। এখন মসজিদে হারামের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে থাকিবে।....." (২/১৪৪)। 'এখন তোমার মুখ আমরা সেই কেবলার দিকেই ফিরাইয়া দিতেছি' অর্থে মক্কার কাবা-মসজিদের দিকেই ফিরাইয়া দিতেছি, বুঝতে হবে। আর 'যাহা তুমি পছন্দ কর'-অর্থে বুঝতে হবে, তোমার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানোর জন্যেই অথবা তোমার মতের সাথে সহমত হয়েই জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে 'কেবলা' পরিবর্তন করা হলো।

২৬। বান্দাহদের প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ

যদিও প্রতিটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক আয়াতসমুহের উদ্ধৃতি আছে তবু-ও পাঠকের, বিশেষ করে কাফেরদের সম্যক উপলব্ধির জন্যে আরও কিছু আয়াত এই অধ্যায়ে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। এতে হয়তো কিছু আয়াতের পুনরুক্তি ঘটবে, পাঠককে তা মেনে নিতে অনুরোধ করছি।

(ক) বিবাহের ব্যাপারে মু'মিনদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, "তোমরা মুশরিক নারীদিগকে কখনও বিবাহ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা ঈমান না আনিবে। বস্তুতঃ একজন ঈমানদার (পড়ুন মুসলীম) ক্রীতদাসী মুশরিক শরীফজাদী অপেক্ষাও অনেক ভাল, যদিও এই শেষোক্ত

নারীকেই তোমরা অধিক পছন্দ করিয়া থাক। (অনুরূপভাবে) নিজেদের কন্যাদিগকে মুশরিক (পড়ুন অমুলমান) পুরুষদের সহিত বিবাহ দিবে না, যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনে (পড়ুন মুসলমান হয়)। কেননা একজন ঈমানদার ক্রীতদাস কোন উচ্চবংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও এই ব্যক্তিকেই তাহারা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে।"....(২/২২১)

(খ) "মু'মিনগণ (পড়ুন মুসলমানগণ) যেন কখনো ঈমনাদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযাত্রীরূপে গ্রহণ না করে। যে এইরূপ করিবে খোদার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক থাকিবে না। অবশ্য তাহাদের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য বাহ্যতঃ এইরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করিলে তাহা আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন।...." (৩/২৮)

(গ) "হে ঈমানদারগণ, (শত্রুর সহিত) মুকাবিলা করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হইয়া থাক। অতঃপর সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা বাহিনীরূপে বাহির হইয়া পড় কিংবা সকলে একত্রিত হইয়া।" (৪/৭১)

(ঘ) ".......কাজেই তাহাদের (পড়ুন কাফেরদের) মধ্য হইতে কাহাকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, যতক্ষণ না সে খোদার পথে হিজরত করিয়া আসিবে। আর সে যদি হিজরত না করে তবে যেখানেই পাইবে তাহাকে ধরিবে, তাহাকে হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করিবে না।" (৪/৮৯)

(ঙ) "হে ঈমানদারগণ! ঈমানদার লোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কাফেরদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলিয়া দিতে চাও?" (৪/১৪৪)

(চ) "হে ঈমানদার লোকগণ! ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদিগকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না,..." (৫/৫১)

(ছ) "যুদ্ধ কর আহলি-কিতাবের সেই লোকদের (পড়ুন ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের) বিরুদ্ধে, যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের দিনের (পড়ুন রোজ কেয়ামতের) প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুল যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে হারাম করে না, এবং সত্য-দ্বীন ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না। (তাহাদের সহিত লড়াই করিতে থাক) যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হইয়া থাকিতে প্রস্তুত হয়।" (৯/২৯)

(জ) "অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তখন মুশরিকদের হত্যা কর যেখানেই তাহাদের পাও; এবং তাহাদের ধর, ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাহাদের খবরাখবর লওয়ার জন্য শক্ত হইয়া বস। অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে (পড়ুন ক্ষমাপ্রার্থী হয়), নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (৯/৫)

(ঝ) "তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে শাস্তিদান করিবেন

এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন, আর তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করিবেন। এবং বহুসংখ্যক মু'মিনের দিলকে ঠান্ডা ও শীতল করিবেন।" (৯/১৪)
(এঃ) "হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ কর সেই সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী রহিয়াছে। তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখিতে পায়। আর জানিয়া লও, আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রহিয়াছেন।" (৯/১২৩)

২৭। উপসংহার

সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকে বস্তুবাদ (Materialism) যার আধুনিক নাম ভোগবাদ (Consumerism) এবং অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) পাশাপাশি চলে আসছে। এর কোনটিই নতুনত্বের দাবী করতে পারে না। আর্যাবর্তের বেদ-উপনিষদের যুগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব তিন থেকে চার হাজার বছর পূর্বে একদিকে যেমন ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা চলছিল, অপরদিকে তারই পাশাপাশি বস্তুবাদের চর্চাও চলছিল। যাঁরা বস্তুবাদের প্রবক্তা ছিলেন তাঁদের মধ্যে চার্বাক মুনির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বস্তুবাদের চিন্তাভাবনা এবং কার্যকলাপ ব্যক্তিকেন্দ্রিকই ছিল, কোনরূপ সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে বস্তুবাদ শুধু সামাজিক স্বীকৃতিই পেলো না, একেবারে রাষ্ট্রীক মর্যাদায়-ও প্রতিষ্ঠিত হলো। বস্তুবাদের প্রতি মনুষ্য-চরিত্রের যে স্বাভাবিক প্রবনতা আছে রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সেই প্রবনতা শতগুণ বৃদ্ধি পেলো এবং দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো, যাকে সগৌরবে ইসলামের জয় জয়কার বলা হয়। এখানেই ইসলাম এবং বস্তুবাদ সমার্থক। এই প্রেক্ষাপটে জানার প্রয়োজন আছে, কোন্ পন্থা-পদ্ধতির মাধ্যম ইসলাম নিজেকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং অদ্যাবধি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

(ক) ইসলাম একটি অসহিষ্ণু মতবাদ। তাদের মতে, ইসলামই একমাত্র সত্য দ্বীন বা বিশ্বাস—আর সব ঝুটা। সত্য দ্বীন বলতে তারা কী বুঝেন? এক কথায়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল মুহাম্মদের প্রতি আনুগত্য এবং রোজ কেয়ামতে বিশ্বাসের নামই সত্য দ্বীন।

(খ) ইসলাম যুক্তি তর্কের ধার ধারে না—বিশ্বাসই বড় কথা। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল যা বলে গেছেন তা-ই শেষ কথা। এর উপর কোন কথা বলা বা প্রশ্ন তোলা যাবে না, প্রশ্নকর্তার বক্তব্য যতোই যুক্তিপূর্ণ এবং মানবিক হোক না কেন। যারা প্রশ্ন তুলবে, তাদের গর্দান যাবে।

(গ) ইসলাম একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। কালের গতিতে কিংবা ঘটনাপ্রবাহের চাপে পড়ে মুসলমানরা মুখে যতোই গণতন্ত্রের কথা বলুন না কেন কার্যক্ষেত্রে কোনদিন তারা গণতন্ত্রী হতে পারবেন না। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল কোথাও তার অনুমোদন দেননি, বরং বিপরীত কথাই বলেছেন। (৬/১১৬ ও ৪৯/৭)।

(ঘ) ইসলাম একটি সামরিক সংগঠন। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সামরিক কায়দায় পরিকল্পিত এবং পরিচালিত। উদ্দেশ্য ঃ ধর্মের নামে বাহুবলে বিশ্বজয়। প্রধান হাতিয়ার ঃ জিহাদ।

(ঙ) ইসলামের অপর প্রধান দুটি হাতিয়ার ঃ প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল এ দু'টি অস্ত্র এমন নিপুনভাবে চালনা করেছেন যার অক্টোপাশ থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত-মাংসে-গড়া মনুষ্য-সন্তানের পক্ষে সেদিনও সম্ভব ছিল না বা আজ-ও নেই। ইহকালে 'মালে গণীমত' এবং পরকালে 'জান্নাতী-জীবনের' প্রলোভন-জাল কেটে ক'জনের পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব? এ-সত্য হজরত মুহাম্মদ তাঁর আল্লাহ্র কাছ থেকে 'অহীর' মাধ্যম জানতে পেরেছিলেন। তাই না তিনি তাঁর চাচা আবু তালীবকে পরম নিশ্চিন্ততায় বলতে পেরেছিলেন, "চাচাজান! আমি এদের (কোরেশদের) নিকট আজ এমন এক 'কলেমা' পেশ করেছি তা যদি এরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে তবে যে তারা সমগ্র আরব-ভূমির উপরই আধিপত্য বিস্তার করবে এমন নয়, একদিন তারা সারা জাহানের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।"

আর ভীতি-প্রদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ 'ইসলামে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিহিংসাপরায়নতা এতো প্রকট কেন?' অধ্যায়ে দেয়া আছে। তাই আর পুনরুল্লেখ করলাম না।

এই পুস্তকের কোথাও 'ধর্ম' শব্দটি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করিনি। কারণ 'ধর্ম' ও 'বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি' এক নয়। পাছে এই শব্দ দু'টি নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হয়, তাই পরিশেষে এই শব্দ দু'টি নিয়ে দু'চার কথা বলবো। ধর্ম ও বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে যে বিরাট এক ফাঁক বিদ্যমান তা আমরা অনেকেই জানিনা বা জানার চেষ্টাও করি না।

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে, ধর্ম এবং বিশ্বাস বা উপসনা-পদ্ধতি এক নয়—এরা দু'মেরুর বাসিন্দা। ধর্ম 'অখণ্ড' আর বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি 'খণ্ডিত'। ধর্মের আবেদন সার্বজনীন; বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির আবেদন সীমিত এবং সংকীর্ণ। এ-আলোচনায় এগিয়ে যাওয়ার পূর্বে এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন আছে। 'ধর্ম' শব্দটি সংস্কৃত। পৃথিবীর যেখানে যতো সত্য, শিব ও সুন্দরের পদচিহ্ন বিদ্যমান তার সব কিছুর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই এই শব্দটির মধ্যে। ধর্মের ভেতর অ-সুন্দরের কোন স্থান নেই। তাই ধর্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ Religion নয় বা হতে পারে না। এই না-হওয়ার কারণ হিসেবে বলা চলে, Religion শব্দটির মধ্যে যেমন কিছু সার্বিক সত্য আছে, তেমনি আছে কিছু খণ্ডিত সত্য যা সম্প্রদায় বিশেষের বিশ্বাস এবং উপাসনা-পদ্ধতির সমষ্টি। সুতরাং Religion-এর বাংলা প্রতিশব্দ সঙ্গত কারণেই হওয়া উচিত বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি। পক্ষান্তরে, ধর্মের নিকটতম ইংরেজী প্রতিশব্দ Religiosity (সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে VIRTUE) হতে পারে অর্থাৎ যেখানে বা যে-সব কাজকর্মে ধর্মভাব বিদ্যমান সে-সব কাজ বা কথাকে

মোটামুটিভাবে ধর্ম-আখ্যায় ভূষিত করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে একথা খাটে না। বিভিন্ন সম্প্রদায় বা মানব গোষ্ঠীর বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের। যদিও প্রতিটি বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির মানবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে কিছু সত্য প্রচ্ছন্ন অথবা প্রকট অবস্থায় বিদ্যমান, তবু-ও তাদের বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতিকে ধর্ম বলা যাবে না। কারণ, ধর্ম-অর্থে যা বুঝায় তা কোন বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে না বা বিদ্যমান নয়। প্রত্যেক বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যেই বিশেষ কিছু নিয়ম-কানুন বা বিধিনিষেধ থাকে যা অন্যান্যদের মধ্যে থাকে না, এমন কি বিরোধের বীজও লুক্কায়িত থাকে। তত্ত্বকথায় বেশীদূর অগ্রসর না হয়ে একটি উদাহরণের আশ্রয় নেয়া যাক।

ভারতবর্ষের হিন্দুর বিশ্বাস এবং উপাসনা-পদ্ধতির সাথে মুসলমানদের বিশ্বাস এবং উপসনা-পদ্ধতি তুলনা করলেই একটা চিত্র বেরিয়ে আসবে যা পাঠকের সহজেই বোধগম্য হবে। আপাততঃ অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এবং উপাসনা-পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি না ফেরালেও চলবে। মুসলমানদের রোজা, নামাজ, হজ ও যাকাত প্রভৃতি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু জান্নাতে বিশ্বাস, কলমা-পড়া, জিহাদ করা, গণীমত আত্মসাত করা বা বন্টন-পদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত আইন প্রভৃতি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ এসব তাদের স্বকীয় বিশ্বাস এবং উপাসনা-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, হিন্দুদের উপবাস-পালন, সব মানুষকেই আত্মীয় বা আপন ভাবা, সবার জন্যে মঙ্গল-কামনা এবং প্রার্থনা করা, তীর্থ-দর্শন, দান প্রভৃতিকে ধর্মাচরণ বলা চলে; কিন্তু জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভেদসৃষ্টি, দীক্ষা এবং মন্ত্র দেয়া বা নেয়া, পৌত্তলিকতা কিংবা সামাজিক বিশেষ কিছু বিধি-নিয়ম প্রভৃতি ধর্ম নয়—বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি মাত্র। এখানে ধর্ম এবং বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা বুঝাবার জন্যে হিন্দু ও মুসলমানের কিছু রীতি-নীতির উল্লেখ করা হলো। এ ব্যাপারে এখন আমরা একটি সংগা নির্ধারণের চেষ্টা করবো। যে-সব বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতিতে ধর্মভাব যতো বেশী প্রকট, সে-সব বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি ততো বেশী ধর্মের কাছাকাছি বলে ধরে নিতে পারি বা মনে করতে পারি। এই সংগা অনুযায়ী কোন বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতিকেই ধর্ম আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। তবে প্রকৃত ধর্ম বলতে যা বুঝায় তার কি কোনই অস্তিত্ব নেই? কিংবা তাকে কি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই আছে এবং চেষ্টা করলে খুঁজেও পাওয়া যাবে।

আশ্রয়-প্রার্থীকে আশ্রয়-দান, বুভুক্ষুকে অন্নদান, বিপন্ন বা বিপদগ্রস্থকে উদ্ধার করা, সদা সত্যকথা বলা ও সদাচরণ করা, পরদ্রব্য অপহরণ না করা, নিজ-স্বার্থে অপরকে আঘাত (দেহ বা মনে) না করা প্রভৃতি ধর্মাচরণেরা মধ্যে পড়ে বা অন্তর্ভুক্ত। এই তালিকা দীর্ঘ করে লাভ নেই। আমাদের প্রাথমিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, সাধারণভাবে অদ্যাবধি আমরা যে-সব সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি (Rituals) এবং আচার-আচরণকে (Behaviours) ধর্ম

আখ্যায় ভূষিত করে আসছি, প্রকৃতপক্ষে তা ধর্ম নয়, বিভিন্ন রকমের বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি মাত্র। ধর্মের নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন আছে—সে নিরপেক্ষ, কারুর পক্ষে সে কথা বলে না বা কাজ করে না। ধর্ম এবং বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতির এই মৌলিক পার্থক্য ভালভাবে অনুধাবন করতে পারলে আমরা পর্বতপ্রমাণ বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাবো এবং অর্থহীন ভুল বুঝাবুঝির স্তুপের-ও সৃষ্টি হবে না। "একজন যুগপুরুষের একটি ছড়ায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য।

'ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে,
সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে।'

"আবার এই বক্তব্যই একটু অন্যভাবে বলেছেন তিনি।

'অন্যে বাঁচায়, নিজে থাকে,
ধর্ম বলে জানিস তাকে।'

"অত্যন্ত সরল ভাষায় ছড়ার ছন্দে ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের যে সংগা পাওয়া গেল তা নিঃসন্দেহে অনন্য। আসলে যাহা আমাদের ধারণ করে, যা যা আমাদের বাঁচা এবং বাড়ায়, (বিয়িং এণ্ড বিকামিং) সাহায্য করে তাই ধর্ম। সব মানুষের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য—তা সে হিন্দুই হোক বা মুসলমান, বৌদ্ধই হোক বা খৃষ্টান।...." (ডঃ অরুণ সান্যাল। সৌজন্যে-স্বস্তিকা, ৫২ বর্ষ-৪১ সংখ্যা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ)।

উপসংহারে ইতি টানার পরও একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। একজন হিন্দু হিসেবে একটি প্রশ্ন মনে খচখচ করছে। এতোদিন যে নিজেকে সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক বলে মনে করতাম তার কী হবে অর্থাৎ তার নিষ্পত্তি হবে কীভাবে? উত্তরে বলবো ঃ এর নিষ্পত্তি কোনদিন হবে না। কারণ হিন্দুর নির্দিষ্ট কোন বিশ্বাস বা উপাসনা-পদ্ধতি নেই, অসংখ্য বিশ্বাস এবং উপাসনা-পদ্ধতি নিয়েই হিন্দুর হিন্দুত্ব। তবে হিন্দুত্বের অভিধান খুললে দেখা যাবে ঃ এর কোথাও কোন গোড়ামী নেই, নেই কোন সংকীর্ণতা বা একদেশদর্শিতা; সৎভাবে থেকে যে যে-ভাবে খুশী সে তার অভীষ্টের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন, দ্বেষ-হিংসা-দ্রোহ এর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানুষে মানুষে সে কোন ভেদ বা বিভেদের সৃষ্টি করে না, সব মানুষকেই সে 'অমৃতের সন্তান' বলে মনে করে ইত্যাদি। এখানেই তার সনাতনত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে 'সনাতন ধর্ম' বলার আর-ও কারণ আছে। তার মানসিকতা বিশ্বের 'সব কিছুই সবার জন্যে' বলে বিশ্বাস করে। 'তার মত ও পথই একমাত্র ঠিক, আর সবারটা ঝুটা এবং মিথ্যা', এরূপ মানসিকতাকে হিন্দু-চিন্তন কোনদিনই প্রশ্রয় দেয়নি। সুতরাং হে কাফের! মা ভৈঃ। চরৈবেতি চরৈবেতি।

২৮। পরিশিষ্ট

FROM THE EDITOR'S DESK

SITUATION AND STATUS OF MUSLIM MINORITIES

The world Muslim population is estimated at about 1.2 billion. About 2/3 of the Muslims live in Muslim majority States and about 1/3 in States in which they form a religious minority.So the total population of Muslim minorities can be taken at about 400 million.

There is hardly a country in which there are no Muslims but in nearly half the member-States of the UN System, Muslim population is very small, say, less than 100,000, sometimes simply negligible. In about 1/3 of the member-State, the Muslims form a majority. Thus we are left with about 1/5 of the member-States i.e. about 40 States in which Muslims form a sizeable and influential community.

Demographic Features

The size and influence is to be measured both in terms of absolute population as well as percentage of the total population. For an overview, one may adopt the cut off unit of 10,00,000 (1 million) or 10% of the total population. A Muslim community within a nation-State which fulfills either criteria is not only visible but modestly influential in the conduct of national affairs. The extent of influence will naturally depend on its political, economic, educational and social status and its contribution to the nation-State in terms of performance in various fields of human activity.

As regards the geographic spread of the Muslim minorities, Asia is at the top with India (150 million), China (25 million) and Russia (15 million) (in Asia), accounting for nearly 50% of all the Muslim minorities. Then comes Africa followed by Europe and Americas respectively. The continental break up of States with at least 10,00,000 Muslims or with at least 10% Muslims in the population is given below :-

% of Muslim Population

Asia
China (2-3%)
India (12.5%)
Israel (14%)
Myanmar (4%)
Nepal (4%)
Mongolia (NA)
Phillipines (5%)
Sri Lanka (8%)
Thailand (10%)
Vietnam (NA)
Europe

Africa
Benin (40%)
Cameroon (16%)
Central African Republic
Ethiopia (49%)
Gambia (10%)
Ghana (20%)
Kenya (15%)
Liberia (20%)
Malawi (20%)
Malagamy (7%)
Mauritius (16.5%)

Bosnia & Herzegovina (40%)
Bulgaria (10%)
Cyprus (30%)
France (5%)
Germany (2%)
Macedonia (30%)
Russia (5%)
Serbia (including Kosovo) (19%)
Ukraine (NA)
U. K. (6%)
Mozambique (20%)
South Africa (5%)
Tanzania (35%)
Togo (10%)
Uganda (16%)
Zaire (NA)
Zambia (NA)
Zimbabwe (NA)

Americas

USA (2%)
Trinidad & Tabago (6%)
Surinam (19.5%)
Guyana (9%)

Within a nation-state, the Muslim minorities are generally dispersed spatially and, therefore, ineffective politically. But there may be districts and even provinces (called States in a federal set up) where they are form a majority. In such units they participate in governance and sometimes even dominate it.

Origin

The origin of the Muslim minorities varies from state to state. In most countries of Europe and Americas they are of recent origin, resulting from post-world war immigration to meet their demand of skilled workers and professionals. In recent times,in the USA, as in most countries of Africa, substantial number of the Blacks have embraced Islam. In fact, Islam is the fastest growing religion in the USA as it is in Black Africa. In West Europe large Muslim communities in Germany, France and the UK are all of post World War II origin but in East Europe, particularly in Bulgaria,Bosnia, Macedonia, Serbia (Kosovo), they are mostly descendants from the Turks and the Slavic converts. In the former British and French colonies like Mauritius, Kenya, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Malawi in Africa, Fiji in the Pacific and Surinam, Guyana and Trinidad and Tobago in South America, most Muslims are descendants of indentured labour from the Indian sub-continent. In India, the Muslims have largely descended from converts to Islam from Hinduism, but include descendants of emigrants from Arabia, Iran and Central Asia who have been thoroughly Indianised over the centuries. In China, a minority are Han by race and have descended from early converts but in Sinkiang they are racially Turks and Mongols. In the Russian Federation, the Chechens, the Kazakhs, the Uzbeks, the Turcomans etc. occupy the southern fringe, contiguous to newly independent Central Asian states which all have a Muslims majority.

Religious Identity

Muslim minorities are jealous of their religious identity and intolerant of any hint of blasphemy or vilification of the essential elements of their faith, namely, Allah, the Holy Prophet and the Holy Quran. They value freedom of religion and given the

experience of the centuries, they resist any interference by the State in the internal affairs of the community, for example, the management of religious institutions, or regulation of family affairs and, therefore, imposition of a common civil code or curbs on self-adjudication. This is the hangover of the Millat system under the Caliphate which granted autonomy and privileges to non-Muslim minorities in the Muslim State. Here one notices a contradiction between the drive of the modern state to regulate all aspects of life of its citizens without exception and the reluctance of the Muslim minority to accept such a regulatory role at least in religious or quasi-religious affairs.

Generally, Muslim minorities resist cultural assimilation and religious syncretism, for fear of absorption and loss of their distinctive religious identity. The national culture as it evolves is largely based on the ethos of the majority; its traditions and customs, will be then reflected in State rituals; its myths and legends will be taught to the children. This is a fact of life that the Muslim minorities have to recognise and learn to limit their objection only to the propagation of the religious beliefs and practices of the majority community through the medium of education and culture with official patronage.

Pan-Islamic Consciousness

Virtually, everywhere, the Muslim minority is accused of pan-Islamic loyalty. Islam is undoubtedly a world religion which its followers regard as universally valid. They share the sense of being members of a common world brotherhood divided by national frontiers. An individual may sometimes be impelled by pan-Islamic consciousness to go to the other end of the world, to an unknown land, to join the struggle of the local Muslim community. But this is a rare occurrence with little impact on the Muslim masses in his home State. Pan-Islamic bond is nothing more than a sentiment or an expression of emotional solidarity particularly in a situation of repression. In the world of nation-states divided by national frontiers, national interest overrides pan-Islamic solidarity. Lip services may be paid to it both by the politician and the priest. But even Haj, the annual event in the Holy Land, which brings together nearly 2.5 million Muslim every year and demonstrates Islamic equality and brotherhood at its highest, never translates into concrete programmes of coordination and cooperation beyond formalities of fraternisation, for less sharing of resources by the fortunate with their less fortunate brethren.

In the foreseeable future, the nation-state will continue to serve as the basic building block of the international order. Muslims have come to terms with territorial nationalism. Even the Islamists speak of conducting Islamic experiments within territorial limits of a nation state. There is no possibility of the emergence of an Islamic sub-order within the international system, say, on the pattern of the European Union, far less of the revival of the Caliphate which may bring together the Muslim majority States into pursuing common objectives and which, if the impossible happens, spread a protective mantle over Muslim minorities, to serve as their guardians, patrons, friends and guides! But then that would be a world divided into Christian, Islamic, Buddhist and Hindu

worlds, a dangerous world indeed to live in.

Structural and Ideological Problems and Remedial Approach

Like all religious minorities, all over the world, even under the most democratic and secular regimes, the Muslim minorities face the problems of religius bias, discrimination and vilification, economic marginalisation and backwardness, social denigration and political under-representation. In the age of Democracy they are subject to majoritarian pressures, particularly in countries with a history of political confrontation. Despite multi-religious plurality, the democratic State tends to take on a majoritarian colour, both in its style of functioning and in constructing a national culture. Generally under-represented in the power structure and the machinery of governance the Muslim minorities are often victims of neglect and forced into ghettos with inadequate civic facilities. Those who make their way up, learn to adjust themselves at both the politico-administrative and socio-cultural levels to the prevalent norms and prefer to remain silent spectators.

A distressed or disaffected or alienated minority has limited options. The first option is mass migration. This will depend upon the possibility of some neighbouring States to act as host. A nation's immigraton policies largely depend on its perceived manpower needs and the skills the migrant group may bring with them. No Muslim State shall open its doors to mass migration either as a humanitarian gesture or a religious duty. In non-Muslim States, Muslim migrants from Muslim-minority States also compete with possible migrants from other States including Muslim majority States. So migration in not a feasible proposition.

The second is conflict and confrontation, provoked by the extremist elements of the majority community or incited by the extremist elements of the minority community. Either way, the minority group suffers. It is the loser, physically and economically. Except as a last resort, no sensible minority will ever adopt suicidal course, leading to certain ruin and annihilation, or at least disruption of the nomal rhythm of life. Unless forced into conflict through unending denial and deprivation, injustice and insensitivity, no minority community,anywhere in the world, will adopt an attitude of perpetual defiance towards the national order, as by law established, or pit itself against the majority community and even demand an inequitable share of power or social goods and services, not commensurate with its essential needs, or human rights or equality under the Constitution. It is sometimes possible that external forces including foreign States, which are hostile to the host State, for serving their own political interests or promoting their own ideologies, incite a Muslim minority. But the game cannot go on endlessly. Soon the minority discovers the selfish, and even diabolical, game, being played at its expense.

Mass genocide aimed at the physical liquidation of a minority as the Holocaust is still a possibility as perpetrated in Rwanda in not distant a past but it is a rare phenomenon in the global village under the watchful eyes of the whole world. Neither

will a minority voluntarily walk to the gas chambers anywhere!

The third is to accept the majoritarian dominance and its own marginalisation, to acquiesce in the status quo without protest and be content with what is thrown at it from the tables of power as a gesture of charity and learn not to assert its human, constitutional and political rights as a group. Physically and mentally and spiritually, such a minority withdraws into itself, in pursuit of physical security and economic subsistence and becomes a passive spectator of the national scene. In the long run, this approach breeds frustration, resentment and anger and has the potential of erupting into a volcano of protest, when collectively it can take no more.

Any minority group which is alienated or is not allowed to play an equal role and enjoy the benefits of citizenship in full, withdraws into its shell and becomes a drag for the national society because it consumes equally but does not contribute equally in the production of goods and services.

Much will depend, therefore, on the form of Government. This takes us to the fourth option. Generally, a democratic and secular order, which has an independent judiciary and a free press, provides effective remedies against the tyranny of the majority as well as keeps alive the hope of a fresh dawn after a long dark night. This hope leads to mutual understanding, accommodation and peaceful coexistence in dignity and justice.

A real problem arises when a minority concentration area is situated at the margin of the state territory, particularly along the border of a neighbouring Muslim-majority State. In such geographical configuration, the kinship factor and the religious pull both come into operation and converge in giving political, economic or cultural discontent a separatist dimension, if the Muslim minority feels oppressed or alienated beyond endurance. The remedy lies in going to the roots of the discontent and adopting suitable constitutional safeguards, political structures, economic measures or administrative arrangements so as to give the Muslim **mojority** in the concentration area a sence of belonging, of participating in governance. In one word, meaningful autonomy with economic development may serve as the antidote to secessionism.

Muslim Minorities in Islamic Fiq'h

Unfortunately the Islamic jurisprudence offers little guidance to the Muslim minorities because during the formative period of the Islamic Fiq'h, Muslim political power was at its peak and the world was seen as divided between Dar-ul-Islam (Zone of Islam), largely under a centralized Islamic regime and the Dar-ul-Kufr (Zome of non-Islam). Dar-ul-Kufr was also Dar-ul-Harb (Zone of War) though it was often transformed in practice into Dar-ul-Mua'hada (Zone of Agreement) or Dar-ul-Aman (Zone of Peace) through treaties and agreements. Such treaties and agreements generally assumed that the Muslims living in the non-Muslim States were the subjects of the Muslim State. Naturally they were treated as transiently resident aliens. The world of naiton-states we live in is radically different, particularly in the common criteria of citizenship for its subjects who may follow different religions, have different cultures

and speak different languages, as they inhabit a common territory.

The Islamic Fiq'h has not kept in step with the restructuring of the world order. So it is largely silent on the rights and duties of Muslim minorities who form an organic part of the national population and are subjects of a non-Muslim nation-state. All it can project is the mirror image of 'non-Muslim zimmis in Muslim States'. This is not acceptable to the Muslim minorities themselves. Development of Islamic jurisprudence on this point is the unfinished agenda which the Islamic jurists have to take up urgently in the first quarter of the 21st century through the process of Ijtehad (Reinterpretation).

Apart from external problems, relating to their relationship with the majority communities or the gap between their status, constitutional and legal and the actual situation the Muslim minorities face many internal problems which they share with the Muslim majorities in other States and which often subjects them to contrary pressures.

Muslim minorities will naturally like to retain their Islamic bond with the Holy Land; they will want to keep the religious identity; to preserve their ethnic memories and cherish their ties with the people of their original homeland in the case of migrants, at least for the first few generations. But with every passing generation, the memories will fade and they shall fit into the national order - political, economic, educational and social and find a reasonable and legitimate place of equality and dignity within the plurality of the nation-state they live in and share the common joys and sorrows, successes and failures, victories and defeats of its people.

1st November 2002 **Sd / Syed Shahabuddin**

(Courtesy - Muslim India, November, 2002)

Our Observation

We must congratulate Mr. Shahabuddin for his untiring zeal to fulfil his mission. But unfortunately, he failed to read the writings of the 'moving fingers'. Otherwise he could not come out with this intriguing editorial, as reproduced above, and on the plea of generating 'sense of belonging' in the hearts of the minorities, suggest afresh "... meaningful autonomy with economic development to the minority concentration area situated.... along the border of a neighbourting Muslim majority state.... as antidote to secessionism".

লেখকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

স্বাধীনতা সৈনিকের ডায়েরী— ৪০.০০
হিন্দুর শত্রু হিন্দু— ৬০.০০
যেকথা বলা হয়নি— ৭৫.০০
কবিতা সমগ্র—৩০.০০
THIS WORLD (Some Basic Truths)— 50.00
THE MANIFESTO OF A DEMOCRAT— 10.00

সংকলিত গ্রন্থ

NETAJI Vs. GANDHIJI—60.00
ISLAM IN INDIA (few facts & opinions)—50.00
মহাভারতের শাশ্বতবাণী—১০০.০০

Available at

Dasgupta & Co (P) Ltd.
54/3 College Street
Kolkata - 700 073

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলকাতা—৭০০ ০০৬